7-12-05
03-8818 (P)

ত্রিপুরার গণ-আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিকথা

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ত্রিপুরা দর্পণ

প্রথম প্রকাশ ঃ

কলিকাতা বইমেলা ১৯৯১

দ্বিতীয় (সংশোধিত) সংস্করণ ঃ

আগরতলা বইমেলা ১৯৯৮

প্রকাশক ঃ

রীনা রায়

ত্রিপুরা দর্পণ

আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রচ্ছদ ঃ

অপরেশ পাল

মুদ্রক ঃ

প্রিন্ট বেস্ট

কর্ণেল চৌমুহনী,

আগরতলা

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

ভূমিকা

অনেক বন্ধুর অনুরোধ ও ইচ্ছা আমাকে স্মৃতি-চয়নে উৎসাহিত করেছে। নিজের যেটুকু লেখার অভ্যাস ছিল তা আত্মপ্রকাশ করেছিল 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' 'চিনি-হা' ও ' ইতিহাস' কাগজের পৃষ্ঠায়। কিন্তু সে লেখার পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল আমার জীবন দর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। কৈফিয়ৎ না দিয়েও বলতে পারি আমার রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এক আচমকা ধাক্কায়। সেটা আমার দুর্বলতা বলেই মেনে নিতে হবে। তবে জীবন সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলে। ইচ্ছা করলেই তা থেকে দূরে থাকা যায় না। সেজন্যই কখনও নির্লিপ্ত থাকতে পারিনি— ঝড়-ঝাপ্টা সত্ত্বেও।

আমার এ লেখা একান্তই আমার নিজের মূল্যায়ন ও নিজের স্মৃতি-চয়ন। কোন কথা জ্ঞাতসারে গোপন করিনি। আর আত্মপ্রচার করবার চেষ্টা যথাসম্ভব সচেতন ভাবেই বর্জন করতে চেয়েছি। বলতে কি আত্মপ্রচারের কোন ইচ্ছাই আমার নেই।

আমি চেয়েছিলাম কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস যুক্তভাবে কয়েকজন মিলে লেখা হোক। এ কথা কমঃ বীরেন দত্তকে বলেও ছিলাম। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় সফল হই নি। যারা এ সম্পর্কে লিখেছেন তা সবই আত্মপ্রচারমূলক কিছুটা বিভ্রান্তিকর ও অমূলক। আমি চেয়েছিলাম 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র অবলম্বন করে ইতিহাস লেখা হোক। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে কাগজের কোন হদিস পাওয়া গেল না। কাজেই স্মৃতির উপর নির্ভর করে আমার রচনা প্রকাশ করলাম। ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে সব আমার নিজের। আশাকরি এটা অমার্জনীয় হবে না। স্মৃতিটুকু ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেলাম। যদি কোন ইতিহাস লেখকের কাজে লাগে তা হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

সমাজতন্ত্রই আমাদের আদর্শ হোক এবং সে আদর্শ কার্যকরী রূপ গ্রহণ করুক। উৎপাদনরত শ্রমজীবী মানুষের শোষন ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি—মার্ক্স সমাজ বিপ্লব বলতে তাই বুঝেছিলেন। বর্তমান পৃথিবীতে মানব মুক্তি এই পথেই গড়ে উঠবে এই আত্মপ্রত্যয় নিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আমার এ বই-এর প্রথম সংস্করণ শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাদরে গ্রহণ করেছেন, পড়েছেন, এজন্যে আমি আনন্দিত। ভাবতে ভালো লাগছে আজও অনেকেই কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসের পেছনের ইতিহাস খুঁজছেন, জানতে চাইছেন সে ইতিহাসের সঠিক তথ্য। পাঠক বন্ধুদের এসব কথা মাথায় রেখেই আমার এ বই-এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৯৭
আগরতলা
৩৯ গান্ধীঘাট রোড

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

লেখক-পরিচিতি

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯৩২ সনে অনুশীলন সমিতির নির্দেশে আত্মগোপন করেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ তারিখে। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় সাজা হয় ৮ বছর । মুক্তি পান ১৯৪৫ সনে আগস্ট মাসে। জেলে কমিউনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠনের কাজে যোগ দেন। মুক্তি পেয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন ও কাজ কবতে থাকেন। আবার ধরা পড়েন ১৯৪৮ সালে। মুক্তি পান ১৯৪৯ -এর মাঝামাঝি এবং গৃহবন্দী থাকেন বেশ কিছু সময়। বর্ত্তমানে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিশনের চেয়ারম্যান। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সর্বসময়ের জন্য কাজ করতে পারেন নি।

১৯৪৫ সনের শেষদিকে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে যখন মুক্তি পাই তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে ত্রিপুরা রাজ্যই আমার পরবর্তী কর্মস্থল হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল সামন্ততন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ। ত্রিপুরা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আবেষ্টনীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য হিসেবে।

বাল্যকাল থেকে যৌবনের প্রথম দিনগুলোর স্মৃতি মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে রেখেছিল। এখনকার সামন্তরাজার অত্যাচার, সরকারী কর্মচারীদের ও সামন্ত প্রভুদের গরীব ও নিঃসহায় পাহাড়ী ও সমতলবাসীদের উপর নির্যাতনের করুণ কাহিনী ও চিত্র যা আমি লক্ষ্য করেছি তারই অবসানকল্পে ত্রিপুরার বুকে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে আর এ ব্যাপারে পার্টির অনুমোদন ছিল স্বাভাবিক।

বলা দরকার মুক্তি পেয়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় যাদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয় তাদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী। বন্ধুবর কমরেড লক্ষ্মীপ্রসাদ চক্রবর্তীর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়, তখন তিনি পার্টি কমিউনে থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবেই কাজ করেছিলেন পার্টির একজন আর্টিষ্ট হিসেবে।

আগরতলায় এসে প্রথমেই যাকে আন্দোলনের পথিকৃত হিসাবে পেলাম তিনি হ'লেন কমরেড বীবেন দত্ত, এর সঙ্গে পেয়ে গেলাম আবো কয়েকজন যুবককে।

বলা প্রয়োজন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রথমে কমরেড বীরেন দত্তই আমাকে ও আমার মত আরো অনেক যুবককেই টেনে আনতে সাহায্য করেন, নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁরই কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হই। যদিও শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্র লাল সিং এবং প্রয়াত উমেশ লাল সিং ও রমেন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। বিপ্লবী আন্দোলনে তাদেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকাব ফলে আমাকে দীর্ঘ কয়েক বছর জেল খাটতে হয়। কমিউনিষ্ট মতবাদের দিকে আমাদেব আগ্রহ জন্মায় জেলখানাতেই। কমিউনিষ্ট মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা গড়ে উঠতে আন্দামান প্রত্যাগত বন্দীদের মূল্যাযণ বেশ কাজে লাগে। আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি দেশের মুক্তি সাধন একমাত্র কমিউনিষ্ট প্রদর্শিত পথেই সম্ভব। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণের বিপ্লবী চেতনা ও কর্মধারার মধ্য দিয়েই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্ভবপর, এর অন্য বিকল্প বর্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নয়।

কমিউনিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা এই পার্টি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ কবলাম। ত্রিপুরা জেলা (বর্তমান কুমিল্লা) পার্টি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লাম। সেই সময় কুমিল্লা পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন কমঃ সুবোধ মুখার্জি। মুক্তি পেয়ে আগরতলায় পৌঁছবার পর প্রথমেই সুযোগ এসে যায় বরুড়া কৃষক সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত হবার। এই সম্মেলনে কমঃ নৃপেন চক্রবর্তীর উপস্থিতি আমাদের সকলকেই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করে। কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কুমিল্লা জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার প্রভাব আমাদেব মনে বিশেষ দাগ কাটে। এই কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে

যাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী এবং যিনি ছিলেন এই আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা তিনি হ'লেন প্রয়াত কমঃ ইয়াকুব মিঞা। বড় মিঞা নামেই তিনি আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। কৃষক আন্দোলনের প্রভাব আমাদের উপর রেখাপাত করে। মনে হ'ল এরকম সংগঠন আমরা ত্রিপুরাতেও আদিবাসী জুমিয়া ও গরীব কৃষকদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি। সেই আকাঙ্খা ও প্রত্যয় নিয়েই বরুড়া থেকে আগরতলায় ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম।

বরুড়া সম্মেলনের পরে কমঃ নৃপেন চক্রবর্তী আগরতলা আসেন এবং আমাদের বাসায় দু'একদিন অবস্থান করে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে ত্রিপুরা সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন। এই সময়ে তিনি ত্রিপুরা সম্পর্কে যে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করেন তার উপর ভিত্তি করে তাঁর একটি প্রবন্ধ পার্টি মুখপত্র স্বাধীনতায় প্রকাশিত হয়।

কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর বুঝলাম প্রয়োগক্ষেত্রে মার্কসবাদ খুবই কঠিন এবং বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সংগঠনের কাঠামো গড়ে তোলা ত্রিপুরা রাজ্যে এক কঠিন কাজ। আর সব সামন্ত রাজ্যের মতো ত্রিপুরা রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি করদ রাজ্য হিসাবেই গন্য হ'ত। পলিটিক্যাল এজেন্টের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁরই পরামর্শে রাজকার্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পরিচালিত হ'ত। পলিটিক্যাল এজেন্টের কুঠি বর্তমান বটতলা বাজারের সন্নিকট টি. আর. টি. সি. অফিস ও নূতন বাজার কমপ্লেক্স যেখানে অবস্থিত সেখানেই ছিল। পলিটিক্যাল এজেন্ট এখানে স্বয়ং উপস্থিত না থাকলে কুমিল্লা জেলাশাসক পদাধিকার বলে পলিটিকাল এজেন্টের কাজ পরিচালনা করতেন। এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রীপদে কাকে নিয়োগ করা হবে তা ও পলিটিকাল এজেন্ট বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। আমরা যে ক'জন মন্ত্রী দেখেছি — প্রসন্ন দাসগুপ্ত, জ্যোতিষ সেনগুপ্ত প্রমুখ তাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন শাসন বিভাগে কর্মরত কর্ম্মচারী। ত্রিপুরা রাজ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের জন্য দরকার ছিল এখানকার আর্থ সমাজ ব্যবস্থার বিন্যাস বিশ্লেষণ।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তৃতি তখন অবশ্য বর্তমান ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্বে বর্মণ এবং অন্যদিকে মিজোরামের কিছু এলাকা এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী পর্যন্ত অঞ্চল এক সময় এই রাজ্যের অংশ বিশেষ ছিল। তবে ব্রিটিশ আমলে সুদূর ফেণী (নোয়াখালী) থেকে শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চল মহারাজার জমিদারী প্রসারিত ছিল যার নাম ছিল চাকলা রোশনাবাদ। ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব থেকেও জমিদারীর আয় ছিল অনেক বেশী। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ত্রিপুরা রাজ্যের গড় আয় ছিল আট লক্ষ টাকার মত, অন্যদিকে চাকলা রোশনাবাদ থেকে আসত প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। শ্রীমঙ্গল, মোগরা, কুমিল্লা ও ফেণী এই চারটি ছিল মহারাজার বড় তহশিল এবং এ সমস্ত স্থানে একজন করে ম্যানেজার নিযুক্ত থাকতেন সমস্ত প্রকারের শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের জন্য। এই সমস্ত ম্যানেজারগণ ত্রিপুরা রাজ্যের সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং রাজ্য স্তরে যে-কোন প্রশাসনিক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হ'তে পারতেন। কাজেই এঁরা ছিলেন রাজার জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রাজ প্রতিনিধি। রাজ কর্মচারীদের সকল সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করতেন। অন্য কর্মচারীরা ছিল জমিদারী সেরেস্তার লোক।

স্বাধীনোত্তর ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূক্তির পর দেখা গেল চাকলা রোশনাবাদের

কর্মচারীদের এই রাজ্যের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবার দাবী অগ্রাহ্য হ'লে কর্মচারী আন্দোলনের তীব্রতার অনুকূলে যায় এবং তারা রাজ্যের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হতে থাকেন। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে চাকলার কর্মচারীদের আন্দোলন ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আমরা সকলেই জানি ব্রিটিশ সরকার আমাদের স্বনির্ভর অর্থনীতিকে ভেঙ্গেচুরে নিজস্ব প্রয়োজনে শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। রেল-লাইন স্থাপন এবং পরবর্তী সময় বস্ত্র-শিল্প, চা-শিল্প (প্ল্যানটেশান) পাট-শিল্প ও ছোট খাট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে তুলে ভারতবর্ষের এক মৌলিক পরিবর্তনের দ্বার উন্মোচন করতে সাহায্য করে ব্রিটিশ।

জমিতে চিরস্থায়ী প্রথা প্রবর্তনের ফলে এক নূতন জমিদারশ্রেণী গড়ে ওঠে এবং সর্বোপরি সামন্ত প্রভুদের সহযোগিতায় ভারতবর্ষের জনগণকে এক নির্মম শোষণের জাঁতাকলে পিশে তাদের জীবন যাত্রায় এক অসহনীয় দুরবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে ভারতবর্ষের স্বনির্ভর অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। এ কথা কারও অবিদিত নয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে তাঁতী, কুমার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যবসা ধ্বংস করে দিয়ে ভারতবর্ষের স্থিতিশীল গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা তথা শিল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিপর্যাস্ত করে দেয়। কার্ল মার্কস অবশ্য শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক ঐতিহাসিক প্রগতিশীল কার্য্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য এ কথাও বলতে দ্বিধা করেন নি যে এ কাজ হয়েছিল এক নির্মম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যার নজীর ইতিহাসে বিরল।

ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের সূচনা কাল বিলম্বে হ'লেও ত্রিপুরা রাজ্যেও তার প্রভাব পড়তে সুরু করে। অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মেই (আন ইভেন ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিজম) অবশ্য শিল্পে পুঁজির কোন অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কিন্তু বণিক পুঁজি ত্রিপুরা রাজ্যের শহর ও গ্রামাঞ্চলে উনবিংশ শতকের ২য় দশকের গোড়ার দিকে ভালভাবেই প্রসার লাভ করে। ফলে ত্রিপুরার আদিবাসীরা ও কৃষক সমাজ এক নির্মম শোষণের শিকার হয়। তাদের উৎপন্ন কাচামাল মহাজন ও ব্যবসায়ীরা অল্প মূল্যে খরিদ করত, তার উপর দাদন প্রথার জন্য (দাদন প্রথা—অগ্রিম বিক্রি) কৃষক ও আদিবাসী জুমিয়ারা নিজ ক্ষেতের ও জুমের উৎপন্ন ফসল মহাজনের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হ'ত। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অভাবী মরশুমে বেশি সুদে টাকা ধার নেওয়ার ফলে আদিবাসীদের প্রায় সমস্ত ফসলের জমিই হস্তান্তরিত হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রে টিলা ভূমিও হস্তান্তরিত হয়। এর উপর আমলা কর্মচারীদের নির্মম অত্যাচার তো ছিলই। অত্যাচারের কথা তখন লোক মুখেও শোনা যেত— আমরাও এমন ঘটনার কথা শুনেছি যে লালপাগড়ী মাথায় পুলিশ কোন বাড়ীতে গেলে সেই বাড়ীর কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হতো, সেজন্য বাড়ির মালিককে জরিমানা দিতে হ'ত। এ ছাড়া ছিল বন-বিভাগের কর্মচারীদের নানাপ্রকার অত্যাচার ও শোষণ। এইসব অত্যাচার যে কত অমানবিক ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

কৃষক জনগণের অবস্থাও এইরূপ শোষণ জর্জরিত পরিস্থিতির মধ্যে আবদ্ধ। কতিপয় ধনী জোতদার ও তালুকদার ছাড়া গরীব চাষীরা ছিল মহাজনদের সর্বগ্রাসী শোষণের শিকার। সামন্ত প্রথার কুফল ছিল সর্বব্যাপী। কোন সরকারী কর্মচারী মফঃস্বলে গেলে তার নির্দেশে

পাহাড়ীদের বেগার খাটতে হ'ত। গ্রামে বা পাহাড় কোন সরকারী কর্মচারী উপস্থিতির অর্থ হ'ল গ্রামবাসী বা পাড়ার লোকদের সরকারী কর্মচারীদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা। এ ছাড়াও ছিল নানাবিধ অমানবিক ব্যবস্থা। তালুকদার ও মহাজনের জমিতে পুরুষাণুক্রমে কাজ করতে হোত বহু আদিবাসী গরীব জনসাধারণকে।

উন্নতিমূলক কোন কাজ কর্ম বা সমাজ কল্যাণমূলক কোন কাজ ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ভঙ্গুর এবং খুবই নিম্ন মানের। সারা রাজ্যে শুধু মাত্র রাজ কর্মচারী ও আমলাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য রাজ্যের কয়েকটি মহকুমায়— বিশেষ করে সীমান্তবর্তী ছোট মহকুমা শহরগুলিতে কয়েকটি স্কুল ছিল। তার মধ্যে উপজাতিদের সংখ্যা ছিল শূন্যের কোঠায়।

একসময় উপজাতিদের নিজস্ব কুটির শিল্প ছিল— বিশেষ করে কোমর তাঁত এবং যা তাদের বস্ত্র জোগাত। জুম চাষে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হ'ত। গ্রাম বা পাড়াগুলো ছিল অনেকটা স্ব-নির্ভর। জুমের উৎপাদিত সরিষা, তিল, কার্পাস অন্ততঃ গ্রামগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করত। লবণ, শুকনো মাছ ছিল তাদের জীবনধারণের অন্য উপকরণ এবং এর যোগান ছিল গঞ্জ ও বাজারগুলি থেকে। এই ব্যবসা ছিল এককভাবে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের হাতে। ধীরে ধীরে হ'লেও বণিক পুঁজির অনুপ্রবেশের সাথে ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য অর্থনীতি ভেঙ্গে উৎপাদিত ফসল তখন পণ্যে রূপান্তরিত হয়। কুটিব শিল্প ভেঙ্গে যায়। কলের প্রস্তুত কাপড় জামা ও প্রসাধনেব সামগ্রী ব্যবসায়ীদের মারফৎ গ্রামে-গঞ্জে অনুপ্রবেশ করে। শোষণের মাত্রা সীমাহীন রূপ পরিগ্রহ করে।

এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, মহাবাজাদের কার্যকলাপ অনেকেই খুব উঁচ্চমানেব সংস্কৃতির প্রবাহমান ধারার সাথে যুক্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের ভাষায় মহারাজ বিশেষ কবে বঙ্গ সংস্কৃতির একটি প্রবাহমান ধারার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহারাজ রাধাকিশোব মাণিক্য বাহাদুরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করতে হয়। শিল্পী হিসাবে বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে রাজপরিবারের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে বিজ্ঞান চর্চার জন্য ত্রিপুরার মহারাজ বহু টাকা দান করেছিলেন। এই সবের ফলশ্রুতি হিসাবে শান্তি নিকেতনের সাথে এই রাজ্যের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। বহু শিল্পী যেমন, ঠাকুর ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মা, রমেন্দ্রচক্রবর্তী, শৈলেশ দেববর্মা প্রমুখ শান্তিনিকেতন থেকেই শিক্ষালাভেব সুযোগ পান। রাজ আমলে বাংলা ভাষারও প্রসার হয়েছে এবং ত্রিপুরাই একমাত্র বাজ্য যেখানে বাংলাভাষা রাজকার্য্যে ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং তার মান যথেষ্ট উঁচু ছিল। বলা বাহুল্য এই কথা সামগ্রিক ইতিহাসের আলোকে বিচার করে সঠিক মূল্যায়ন করলে তাঁদের (মহারাজাদের অবদানের) যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া হবে।

মহারাজ নিজের বংশ গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজ বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন এবং এই রাজবংশ যে আর্য সভ্যতা থেকে উদ্ভুত সে কথা প্রমাণেব জন্য 'রাজমালা' নামক পুস্তকে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের কৃষ্টিপাথরে তাকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে তা সবই অমূলক। শুধু রাজ গৌবব বৃদ্ধি করবাব জন্য এবং এক অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই এই প্রচেষ্টা।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই সংস্কৃতি ছিল উঁচু বর্গের লোকদের (এলিটস্-দের)। রাজ্যবাসী সাধারণ লোক কি উপজাতি বা কি অ-উপজাতি এই সংস্কৃতির সাথে কারো কোন পরিচয় ছিল না।

মহারাজ নিজ পরিবার ও বংশকে একটা মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। শহরবাসী নিজ পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের এবং এ ছাড়া কিছু সর্দার প্রধানদের মধ্য থেকে একটি ঠাকুর শ্রেণী গড়ে তুলে রাজধানী এলাকায় সামাজিক মান দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন।

ধর্ম সংস্কারের নামে হিন্দু ধর্মের আচরণ বিধি বাধ্যতামূলক ভাবে পাহাড়ীয়াদের মধ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবর্তন করেছিলেন। বলা প্রয়োজন বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বহুপূর্বেই এই রাজ্যের কোন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কিন্তু মহারাজার পরবর্তী সংস্কার ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও পুরোহিত তন্ত্রের (ব্রাহ্মণ্যবাদের) প্রসারকল্পে এক দৃঢ় পদক্ষেপ।

ঠাকুর লোকদের কিছু সরকারী পদস্থ কাজে নিয়োগ ও সামরিক বাহিনী গঠন করে কিছু সংখ্যক ঠাকুর যুবকদের নিয়োগ করে নিজের শাসন কাঠামো দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করবার চেষ্টা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ঠাকুর শ্রেণীর সুবিধা ভোগ ও ঠাকুর যুবকদের আভিজাত্য বোধ নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠত। তাঁরা নিজেদের এক ভিন্ন শ্রেণীর লোক হিসাবে নিজেদের স্বাতন্ত্রবোধ সমস্ত কাজের মধ্যে প্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এই ঠাকুর যুবকদের এক অংশই পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্মে ঠেঙ্গাড়ে বাহিনী হিসাবে কাজ করেছে এবং কিছু অংশ প্রগতি আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে এ রাজ্যে প্রগতি আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে এ রাজ্যে প্রগতিশীল আন্দোলনে অগ্রগামীর ভূমিকাও পালন করেছে।

প্রশ্ন আসে বাঙ্গালী সংস্কৃতির সাথে এবং বাঙ্গালীদের সাথে এই নিবিড় যোগসূত্রের হেতু কি? সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। এবং এ সম্পর্কে ইতিহাসের ছাত্রদের বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পর্য্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

তবে এ কথা সত্যি যে রাজকার্যে বাঙ্গালীদের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তা ছাড়া ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণও সুস্পষ্ট। বহুপূর্ব যুগ হতে- এ রাজ্যের বিস্তৃতি পূর্ব বাঙ্গলার এক অংশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরস্পর ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে রাজবংশের সাথে অন্য ধারার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হওয়ার ঘটনা সুবিদিত। মানব সভ্যতার এক প্রবহমান ধারার সাথে যোগসূত্র তাই অস্বীকার করা যায় না। সে সুবাদে বাঙ্গালী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা স্বাভাবিক। আর মনে রাখা দরকার বাঙ্গালী সংস্কৃতি ছিল এক মিশ্র সংস্কৃতির ধারার এক রূপান্তরিত রূপ। যার মূলে রয়েছে আর্য সভ্যতারই এক ভিন্নতর প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক কারণেও জমিদারী কার্য্যে বাঙ্গালীদের সাথে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে রাধা-কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পূর্ব থেকেই দেখা যায় বাঙ্গলা সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র। যদুভট্ট প্রভৃতি কৃতি ও প্রতিথযশা ব্যক্তিরা এই রাজ্যের রাজসভা অলংকৃত করেছে। আমাদের নিজেদের কালেই দেখেছি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মহৎ শিল্পী হিসাবে পরিচিত। সে যাহা হোক এই কৃষ্টি ছিল রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর

বিশেষ করে উপজাতিদের মধ্যে তার কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। রাজবাড়ীর ক্রিয়া কর্ম, পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ — এছাড়া বসন্ত উৎসব, নতুন বর্ষে মেলা অনুষ্ঠান এবং মহারাজ কুমারের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত সামন্ত-প্রভুদের আভিজাত্যের পরিচয়। অন্যদিকে ছিল নিপীড়িত জনসাধারণের করুণ দৃশ্য যা ছিল ভয়াবহ ও মর্মান্তিক।

আদিম সভ্যতার যে স্তরকে আমরা হো কালচার বলি সেই স্তরেই উপজাতিরা জীবন ধারণ করত। উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কই সাধারণতঃ সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান নিরূপণে সাহায্য করে। সেই ভিত্তিতে বিচার করলে ত্রিপুরা রাজ্যের সভ্যতার মান কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার মানের চেয়েও নীচু ছিল। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও এখানে বিরাজ করছিল এক আদিম উপজাতি সমাজ। যে সমাজ ধনিক বণিকগোষ্ঠী ও সামন্ত প্রভুর শাসন ও শোষণের এক চরম দুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করছিল।

জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯৪১ সনের সেন্সাস অনুযায়ী এ রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৫ (পাঁচ) লক্ষের সামান্য কিছু বেশী। আনুপাতিক হারে ত্রিপুরী ও অন্যান্য পাহাড়ীয়াদের সংখ্যা ছিল ৫২%। বাঙ্গালী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২০%। মনিপুরী, বাঙ্গালী হিন্দু, চা বাগান শ্রমিক ইত্যাদি সব মিলিয়ে বাদবাকী জনসংখ্যা যোগ করে মোট জন সংখ্যার প্রকৃত আনুপাতিক হার কি ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যে মণিপুরীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বাজার জাত উৎপাদনের হার ছিল নিম্নরূপ ঃ —

	জনসংখ্যা (আনুপাতিক হার)	বাজারজাত (মোট উৎপাদনের হার)
মুসলমান কৃষক	২০%	৬০%
উপজাতি সম্প্রদায়	৫২%	১০%

বাদ বাকী কৃষিজাত দ্রব্যের অধিকাংশ উৎপাদিত হত মণিপুরী কৃষকদের দ্বারা, জিরাতিয়া প্রজাদের দ্বারা (এদেরও অধিকাংশ ছিল মুসলমান) এবং সামান্য কিছু অন্য সম্প্রদায়ের কৃষকদের দ্বারা। কৃষিপণ্যের উৎপাদনের দিক থেকে মুসলমান চাষীরা ছিল অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন। সে দিক থেকে রাজদরবারে ও ঠাকুর লোকদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক আর্থিক লেনদেনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যদিকে স্বভাবতঃই পাহাড়ীয়াদের উপর মুসলমান প্রজাদের শোষণ ভিত্তিক সম্পর্ক ছিল — ধনী চাষী ও গরীব চাষীর মধ্যে সম্পর্কের সমতুল্য।

উৎপাদিত দ্রব্য বলতে বিশেষভাবে বোঝায় ধান এবং ক্যাশ ক্রপ হিসাবে সামান্য কিছু পাট, জুমে উৎপাদিত তুলা, তিল, সরিষা (অয়েল-সীডস)। উপজাতিদের উৎপাদনের প্রায় সবটাই মহাজনের ঘরে চলে যেত। ওজনে কম, বাজার দর থেকে অনেক কম মূল্যে খরিদ, আগাম বিক্রি (অ্যাডভান্স সেল), দাদন নেওয়ার জন্য মহাজনের জমিতে বেগার খাটা এ সবই ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্বাভাবিক রীতিনীতি। মনে হ'ত আবহমান কাল থেকে এ প্রথা চলে আসছে এবং আবহমান কাল চলিতে থাকবে। একেই বলা হত শান্ত পরিবেশ ও উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক — তা শোষণ ও নিপিড়নের মাত্রা যতবেশীই হোক না কেন? ধান-চাউলের

একটা বড় অংশ এবং উৎপাদিত অন্যান্য কৃষিপণ্য প্রায় সবটাই রাজ্যের বাইরে চলে যেত। প্রথমতঃ জিরাতিয়া প্রজাদের মারফৎ। দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি বাণিজ্যের ভিত্তিতে। এর থেকে যে শুল্ক আদায় হ'ত তা ছিল রাজ্যের রাজস্ব। আমলিঘাট, সোনামুড়া, বিলোনীয়া, কলমচোরা, কৈলাশহর, খোয়াই, ধর্মনগর ছিল কতকগুলি বহিঃরাজ্যের সাথে মাল রপ্তানীর চিহ্নিত ঘাট। বনকর ঘাট বনজ সম্পদ — বাঁশ, ছন, বেতসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য একই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রপ্তানীর ব্যবস্থা চালু ছিল।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার যে চিত্র আমরা পাই তাতে স্পষ্টতঃই ত্রিপুরা রাজ্যের একটা পরিস্কার ছবি আমাদের কাছে ধরা পড়ে। অবশ্য শোষণের তীব্রতা যে কত বড় বেশী ছিল তা ফুটিয়ে তোলা খুবই কষ্টকর। কম বেশী শোষণ সকল সম্প্রদায়ের লোকদের উপরই চলত। তবে যেহেতু উপজাতি প্রজাদের অবস্থান ছিল আদিম এক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর এবং সেহেতু তাদের জীবনধারা ছিল একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই তাদের দৈন্যদশার কোন বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমার নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছি খাদ্য সামগ্রী ও অন্য সামগ্রীর অপ্রতুলতার জন্য নিজ গৃহপালিত পশুর সাথে একই বাসনে আহার করত।

বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হবে যে, এ রাজ্যে সেদিন যারা বাস করত — সেই জনগণকে তিন স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ আমলা কর্মচারী ও ঠাকুর সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত শহরবাসী জনগণ। কয়েকটি ছোট বড় গঞ্জের (বাজার) ছোট বড় ব্যবসায়ীরাও আদর্শগতভাবে এই শহরবাসীদের সমগোত্রীয় ছিল। কার্য কারণে এই শ্রেণীর লোকেরাই ছিল মহারাজার শাসন ও শোষণ যন্ত্রের ভিত্তি। পরবর্তী কালে এবং আজও দেখা যায় মোট জনগোষ্ঠীর এই অংশই প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে বড় সমর্থক। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে করার কোন কারণ নেই যে এই মধ্যবর্তী শ্রেণী একটি হোমোজেনাস ইউনিট। মোটেই তা নয়। বরঞ্চ ঐক্যবদ্ধ শোষিত জনগণের আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির সাথে এদের মধ্যে বিভাজন ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ হ'ল সমতলভূমির কৃষক সম্প্রদায়। এরাই রাজ্যের খাদ্যশস্য উৎপাদন করত এবং অনাবাদি জমি মহারাজার কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে বা নামমাত্র খাজনার পরিবর্তে জোত-জমির মালিকানার অধিকারী হ'ত। এ প্রসঙ্গে বলা চলে জরীপ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য যেভাবে জমি বন্দোবস্তের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল তা ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্ত। এই জমি বিলি বন্দোবস্তের কাজ ছিল আমলা কর্মচারীদের নানারূপ সুযোগ সুবিধা ও অন্যায় জুলুমের বিচরণ ক্ষেত্র। বন জঙ্গল বেষ্টিত বলে এই সমস্ত জমি প্রায় সব ক্ষেত্রেই মাপে গরমিল থাকত। ১ কানি (৪০ ডেসিমেল) জমি ১ দ্রোন (১৬ কানি) হ'তে বাধা ছিল না। প্রচলিত ব্যবস্থায় দেখা গেছে যে, মুসলিম সম্প্রদায় ভাল কৃষক হিসাবে মহারাজার অনুগ্রহ সব সময় পেয়ে এসেছে। অবশ্য এই ব্যবস্থায় কৃষি কাজের অনুকূলে এক সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল—যদিও উপজাতিদের স্বার্থ সুনির্দিষ্টভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে । উপজাতিরা যেমন জুম চাষের উপর নির্ভরশীল তেমনই থেকে যায়। তাদের জন্য কোন পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই রাজ্যের উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশ জমিই সমতল ভূমির অউপজাতি কৃষকদের হাতে চলে যায়।

তৃতীয়তঃ হ'ল উপজাতি সম্প্রদায় যারা কৃষিকাজে অনভ্যস্ত এবং মূলতঃ জুম চাষ (হো কালচার) এর উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। এদের উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুমেয়। এরা বড় জোর তিন/চার মাসের খোরাক উৎপাদন করতে পারত। এবং এই উৎপাদিত খাদ্যশস্য, তিল, কার্পাস সবই মহাজনের ঘরে অগ্রিম বিক্রি হিসাবে চলে যেত। বৎসরের বাকি সময় হয় বাঁশ, ছন কেটে বা বনের উপজাত কোন দ্রব্য-সামগ্রী বাজারজাত করে কায়ক্লেশে কোন রকমে জীবন ধারণ করত। কোন কোন সময় দাদন নিয়ে অথবা মহাজনের জমিতে বেগার খেটে জীবন ধারণ করত। শিক্ষা ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আমলা-কর্মচারীদের সুবিধার জন্য সীমান্ত সংলগ্ন মহকুমা শহরগুলিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। স্বভাবতঃই মহারাজার শাসন যন্ত্রের ভিত্ এরাই রক্ষা করে আসছিল। দরিদ্র উপজাতি প্রজাসাধারণ ও অনান্য অউপজাতি সম্প্রদায়ের জনগণ একদিকে সামন্তরাজা ও অন্যদিকে বণিক পুঁজি ও মহাজন ও আমলাতন্ত্রের নিষ্পেষণে এক মর্মন্তুদ জীবন ধারণ করে আসছিল।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় এই তিন স্তরের মধ্যে কতকগুলো স্ব-বিরোধী দ্বন্দ্ব কাজ করে চলেছিল। যার বহিঃপ্রকাশ ছিল না সত্য—কিন্তু ফল্গু ধারার মত তার অস্তিত্ব আদের কাছে আলাপ আলোচনা ও মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল। এই দ্বন্দ্বে র সমাধান সূত্র আমাদের খুঁজতে হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং জাতি-উপজাতি সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রসারের মধ্য দিয়ে।

সামন্ততন্ত্রের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এই ত্রিধারার সমাবেশ বহুদিন ধরে চলে আসছিল। রাজতন্ত্রে ছত্রছায়ায়, শোষণ ও শাসনের নির্মমতা মানুষ উপলব্ধি করতে পারলেও তার বিশেষ কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের সাথে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাজেই একদিকে যেমন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল অপরিহার্য তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামও ছিল এই একই সংগ্রামের অন্যদিক।

সামন্ততন্ত্রের পরিকাঠামোর মধ্যে যে শ্রেণী বিন্যাস সংগঠিত ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল তার সমাধান সূত্র খুঁজতে হয়েছিল। কি ভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে এই বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীকে এক বৃহৎ আন্দেলনের পরিমণ্ডলের মধ্যে টেনে এনে একত্রিত করা যায় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায়, এই ছিল আমাদের ভাবনা।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শোষণ ও জুলুম। অথচ অন্য সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীগুলোও ছিল সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারের শিকার। মানুষের কোন রাজনৈতিক অধিকারই ছিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। আইনের কোন শাসন ছিল না। মেয়েদের উপর নানাবিধ অত্যাচার ছিল রাজ্য ও তার অনুচরদের সীমাহীন ব্যাভিচারের পরিচায়ক। ফলে তাদের কোন বিকাশ ঘটতে পারছিল না।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এই ত্রিধারা স্বভাবতই কতকগুলো এ্যানটাগোনিস্টিক

কনট্রাডিকশন সৃষ্টি করেছিল। এই দ্বন্দ্বকে আমরা পর্যায়ক্রমে শ্রেণী দ্বন্দ্ব হিসাবেই অবহিত করতে পারি। এর চরিত্র ও বিকাশ ইতিহাসের সময়সীমার মধ্যে পরিবর্তিত অবস্থায় একেক সময় একেক ভাবে বিকাশ লাভ করেছে। ফলে এই সংগ্রামকে নিখুঁত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। অন্যথায় এই সংগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে চলে যেত।

একটু পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীর বনাম ভূমির কৃষক শ্রেণী ও শহরবাসী আমলা কর্মচারী, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এবং তা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাষা, সংস্কৃতি সব কিছুর মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব কাজ করে চলে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিতে এই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ত্রিপুরার সার্বিক পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে নিপীড়ন ছিল সামগ্রিক সেখানে কৃষককূলের সাথে উপজাতি জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার প্রবল উপাদান ছিল—এবং তা ভবিষ্যতে সংগ্রামী যৌথ মোর্চা গড়ে তুলতে সাহায্য করে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিকাশ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আরও একটু আলোকপাত করা যাক। যদিও এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত শাসন কাঠামোকে চালিয়ে রাখবার এক আংশিক ও অসম্পূর্ন প্রচেষ্টা মাত্র। স্বাভাবিক নিয়মেই আমলাতন্ত্রের স্বার্থেই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত। তা হ'লেও ঠাকুর শ্রেণী ও মহারাজার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও নিজ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ত্রিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার যতটুকু সম্প্রসারণ ঘটে তার ফলে কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে এক নতুন চিন্তাধারার পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। নিজ সমাজের মধ্যে একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলার চিন্তাভাবনার শুরু হয়। তাছাড়া বাঙ্গালী আমলা কর্মচারীদেব ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও বহিঃরাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও কিছু পরিমাণ প্রগতিশীল মানসিকতা গড়ে উঠে। তার প্রতিফলন দেখা যায়, বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে। বিপ্লবী সংগঠন এরাজ্যে দানা বেঁধে উঠে প্রথম মহাযুদ্ধেব সময়কালের মধ্যে। এরাজ্যের ছেলেই ছিলেন প্রয়াত ক্ষিতীশ ব্যানার্জী। যিনি ১৯১৫ সন (আনুমানিক) থেকেই বহুদিন ব্রিটিশ কারাবাসে ছিলেন। তাছাড়া ঐ সময় বহু বিপ্লবী এরাজ্যে চলে আসেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। জানা যায়, এরাজ্যে পাহাড়ে বহু স্থানে বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল। পরবর্তীকালে সময়সীমা ১৯২৭ সন নাগাদ আবার নতুন করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠে - বিশেষ করে অনুশীলন সমিতির সংগঠকদের চেষ্টায়। পরবর্তীকালে যুগান্তর পার্টিও এরাজ্যে সংগঠন গড়ে তুলে। এই সংগঠনের পুরোভাগে ছিলেন কমঃ বীরেন দত্ত, শচীন্দ্রলাল সিং, মান বিশ্বাস ও আরও অনেকে। তবে, বলা দরকার এই সংগঠনগুলি প্রথমে কিছুটা ব্রিটিশ বিরোধী ছিল ঠিক সেই অনুপাতে স্থানীয় সমস্যা ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের সূচনা করেনি। ব্রিটিশ বিরোধী ভাবধারা নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্য দিয়েই কর্মীরা অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে। এবং এই রাজ্যে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন গড়ে উঠে। এই বিপ্লবী ভাবধারার বিশ্বাসে অনেকেই পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হ'ন এবং এই রাজ্যে কমিউনিষ্ট ভাবধারা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

অন্যদিকে ঠাকুরলোক ও ত্রিপুরী ছেলেদের মধ্যে শিক্ষার সামান্যতম প্রসার সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক ছেলেদের মধ্যে কিছু কিছু সমাজ সংস্কারমূলক কাজের জন্য আগ্রহ নানাভাবে আত্মপ্রচার করে। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা যিনি পালন করেন তিনি ছিলেন প্রয়াত অমরেন্দ্র দেববর্মা ওরফে বংশী ঠাকুর। পরবর্তীকালে তার সংস্পর্শে ত্রিপুরী ছেলেদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন - মতপার্থক্যও মতান্তর সত্ত্বেও।

আমাদেরও ছাত্রাবস্থাও জেল থেকে মুক্তি (দ্বিতীয় দশকের শেষ, তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি ও চতুর্থ দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত) এই সময়টা ছিল মহারাজার শাসনকালের এক অন্ধকারময় যুগ। ছাত্র ও যুবকদের নিপীড়ন অব্যাহত বেখে মহারাজা তখন ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ শক্ত করবার চেষ্টায় ব্যস্ত। প্রজাদের উপর শোষণ ও নির্যাতন অব্যাহত রেখে তিনি তখন নিজের শাসন ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে তুলে রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে লিপ্ত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মহারাজার ইউরোপ ভ্রমণ এবং মুসোলিনীর সাথে তার আলাপ আলোচনা এবং পরবর্তীকালে রাজপ্রাসাদে মুসোলিনীর মর্মর মূর্তি স্থাপন প্রমাণ করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। যা ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তব। মনে রাখা প্রয়োজন যে সময়টা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অগ্নিগর্ভ যুগ। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন (লবণ আইন ভঙ্গ), মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ভগৎ সিং ও তাঁব সহকর্মীদের ফাঁসী, নিরাপত্তা আইনে অনির্দিষ্টকালের জন্য হাজার হাজার যুবককে বন্দী কবে রাখা — এসব কিছুই ছিল এক বিরাট আলোড়নের সূচনা। আমিও এ সময় এক ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হই এবং বহুদিন ধরে এক বিশেষ আদালতে (ট্রাইবুন্যাল) বিচার হ'বার পব ১৯৩৭ সনে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই। উল্লেখ প্রয়োজন যে, আমি ১৯৩৩ সনে প্রথম দিকেই আত্মগোপন করে কাজ করে চলি এবং ১৯৩৫ -এর ৩০শে ডিসেম্বর গোপন আড্ডাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় থাকি। ঐ অবস্থায়ই আমি ও আরও অনেকে ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ ষড়যন্ত্র ও নানাবিধ ধারায় অভিযুক্ত হই। এই মামলায় আমার আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই যখন পরিস্থিতি ও ভারতব্যাপী এক গণ বিক্ষোভের প্রকাশ তখন এই রাজ্যেও ছোটখাট নানারকম আন্দোলন গড়ে ওঠে। একদিকে গড়ে উঠে বিপ্লবীদের গুপ্ত সংগঠন এবং অন্যদিকে সমাজ সংস্কারমূলক নানাপ্রকার আন্দোলন এবং এই অবস্থারই প্রেক্ষাপটে পরবর্তীকালে প্রজা আন্দোলন।

এই সময় আমরা দেখতে পাই কৃষকদের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কৃষক সমাবেশ। এই কৃষক আন্দোলনের সাথে স্বভাবতই পাহাড়ী জনসাধারণের কোন অংশের সেরূপ সংশ্রব ছিল না। পরবর্তীকলে অবশ্য বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রতনমণির নেতৃত্বে উপজাতিদের মধ্যে বিদোহ আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায় আলোচনার সুযোগ পাব। এই সময়ের কৃষক আন্দোলন বিভিন্ন খাতে প্রভাবিত হতে থাকে ফলে এই আন্দোলন কৃষকদের দাবী দাওয়া নিয়ে খুব একটা সফলতা লাভ করেনি। তবে রামনগর এলাকায় বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে

এখানকার কৃষকরা যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখায় এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে বিশিষ্ট দেশসেবী ও কংগ্রেস কর্মী শ্রীশচীন্দ্র লাল সিং-এর নেতৃত্বে। কৃষকরা শুধু মাত্র মহারাজার আনুকূল্য লাভে বঞ্চিতই হয় নি অবর্ণনীয় অত্যাচারেরও সম্মুখীন হয়। মণিপুরী কৃষক ও অন্যান্য কৃষকদের মধ্যেও কিছু চাপা উত্তেজনা তখন আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে বহু কর্মী ও দেশসেবক নিগৃহীত হ'ন ও এই রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট বরণ করেন। মনে রাখা দরকার তিন দশকের মাঝামাঝি ত্রিপুরা জেলাতে (ব্রিটিশ) প্রবল কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের কথা আমরা জেল খানাতেই অবহিত হই। এই আন্দোলনের ফলে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠিত হয় এবং কৃষকরা কিছুটা পরিমাণে মহাজনের ও লগ্নীকারীদের হাত থেকে রক্ষার সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। তা ছাড়া ত্রিপুরা মহারাজার জমিদারী এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক প্রজার অনেক জোত জমি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল। এই সমস্ত প্রজাদের জিরাতিয়া প্রজা বলা হত। জিরাতিয়া প্রজাদের অনেক অভিযোগ ছিল রাজ কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। জিরাতিয়া প্রজারা—তাদের উৎপন্ন ফসল নিজেদের বাড়ীতে নিতে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হত। নানাভাবে আমলা কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করতে হত।

জিরাতিয়া প্রজাদের দাবী ছিল পাহাড় ও বনের উৎপাদিত বনজ সম্পদ স্বাভাবিক নিয়মে আহরণ করার এবং এই অধিকারের ন্যায় সঙ্গত স্বীকৃতি। অবশ্য বলে রাখা প্রয়োজন এই দাবীগুলোর অনেকগুলো ছিল ত্রিপুবা রাজ্যের স্বার্থের পবিপন্থী। বিশেষ করে ছিল বনজ সম্পদ বিনষ্ট হবার আশঙ্কা। পরবর্তীকালে আমরাও জিরাতিয়া প্রজাদের সংস্পর্শে আসি এবং এই সমস্ত দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। কাজেই জিরাতিয়া প্রজাদের আন্দোলন কোন সময়েই ন্যায়সঙ্গত রূপ নিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের সূচনা করতে পারেনি।

গণ আন্দোলনের এই পটভূমির মধ্যেই—তিন দশকের শেষের দিকে দু'এক জন আন্দামান প্রত্যাগত বন্দী ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে আসেন। তাঁবা সকলেই কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বন্দী শিবিরেই কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী অন্য বন্দীদের সাথে মিলিত ভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। সেই ভিত্তিতে জেলখানার বাইরে এসেও কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন ও কম্যুনিষ্ট ভাবধারা নিয়ে বিশেষ করে ছাত্র যুবকদের মধ্যে কাজ করতে প্রয়াসী হ'ন। এই সময়ে যারা মুক্তি পেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আসেন তাঁরা হ'লেন আন্দমান জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত প্রয়াত নলিনী সেনগুপ্ত ও অনন্তলাল দে। তা ছাড়া অন্য যিনি মুক্তি লাভ করে আসেন তিনি হ'লেন বীরেন দত্ত। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পথিকৃত হিসাবেই তিনি পরিচিত। বীরেন দত্ত এই সময়ে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলবার কাজে ব্রতী হন। কমঃ বীরেন দত্ত অবশ্য কৃষক আন্দোলনের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। যদিও এই আন্দোলনের গতিবেগ এই সময় মন্থর হয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সারা দেশের বুকে নিয়ে আসেএক গভীর সংকটের ছায়া। ত্রিপুরা রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মহারাজা যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সব রকমভাবে সহযোগিতা করে চলেন এবং সেই মত প্রতিশ্রুতি দেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। ত্রিপুরার বুকে বিভিন্ন

স্থানে সৈন্যদের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন (ত্রিপুরীদের নিয়ে গঠিত) বর্মা সীমান্তে জাপানী অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মোট কথা ত্রিপুরা রাজ্য হয়ে ওঠে যুদ্ধের সীমান্তবর্তী এলাকা। এই পরিস্থিতিতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় পুরোপুরি আমলা নির্ভর। যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এক শ্রেণীর মোসাহেবের দল। যাদের নিপীরণে প্রজাসাধারণের দুর্ভোগ চরমে উঠে। অন্য চিত্র হল গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে রুখতে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রচলিত নিবর্তনমূলক আইনের অবাধ প্রয়োগ। এ কথা বলতেই হয় যে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ততটা সংগঠিত রূপ নিতে পেরেছিল সেই বিচারে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা রাজ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত ও সক্রিয় সহযোগী। ফলে দমনমূলক সব রকম আইনেব প্রয়োগে ব্রিটিশ প্রতিনিধি পলিটিক্যাল এজেন্টের নির্দ্দেশই ছিল শেষ কথা। যুদ্ধ শুধু অত্যাচার ও উৎপীড়নই নিয়ে এলোনা—নিয়ে এল এক নতুন সামাজিক পরিবেশ। যেখানে অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক পদ মর্য্যাদার প্রধান মানদণ্ড। উৎকোচ, দুর্নীতি, চোরাকারবার সমাজ জীবনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত কবে। ফলে জন জীবনের দুর্গতি অনেক বেড়ে যায়। অসন্তোষের প্রকাশ না ঘটলেও কিন্তু তা চাপা থেকে যায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। সামাজ্যবাদ বিরোধী অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে এবং ১৯৪২ সনে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ভারতছাড় (কোয়াইট ইন্ডিয়া) আন্দোলনের ডাকে গণ-বিক্ষোভ ও গণ অসন্তোষ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দাবানলের মত ছড়িয়ে যায়।

কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সে আন্দোলনের কোন প্রভাব দেখা যায় না। ১৯৪১ সালের ২১শে জুন হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়নেব উপর আক্রমন করার সাথে সাথে যুদ্ধের গুনগত পরিবর্তন ঘটে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-বিক্ষোভ অদমিত থাকে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর হয়, জননেতা সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে গঠিত হয় এবং অমিতবিক্রমে এই ফৌজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করে। কম্যুনিষ্ট পার্টি এই যুদ্ধের সঠিক বিশ্লেষণ করলেও যুদ্ধের দ্বৈত চরিত্র সঠিক নিরূপণ কবে সংগ্রামের রণকৌশল সঠিক রূপায়ণে ব্যর্থ হয় এবং বিরাটভাবে দেশের সংগ্রামী জনগণ থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই অবস্থার জন্য কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বা গণ-অসন্তোষ কোন সংগঠিত রূপ নিতে পারেনি। জাতির এই সঙ্কটময় সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কম্যুনিষ্টদের এক বিরাট ব্যর্থতা।

যা হোক জাপানী আক্রমণের মুখে ব্রিটিশ সৈন্য পিছু হটতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ আমাদের সীমান্তে চলে আসে। ফলে জনজীবনের দুঃখ দুর্দশা আরও তীব্রতর হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ী ও মহাজনের অত্যাচার বেড়ে যায়। এ অবস্থায় একদিকে রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্রভাবে অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ কবে। এই আন্দোলন লবণের অভাবের জন্য তীব্রভাবে সংগঠিত হবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব ও ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ মিত্র শক্তির জয় এক নতুন যুগের সূচনা করে অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষে গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং মহাত্মা গান্ধী

পরিচালিত অহিংস আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয়। সংগ্রামের এই সত্যনিষ্ঠ পথ পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে সংগ্রামী জনসাধারণকে উজ্জীবিত করে তোলে। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে অহিংস সংগ্রামের পথ এক মহান আদর্শের নজীর স্থাপন করে। সেই সময় সশস্ত্র সংগ্রামের বিশ্বাসী বিপ্লবীদের মধ্যেও এই আদর্শ ও পথ আলোড়ন সৃষ্টি করে। যারা কারাগারে ছিলেন তাঁরাও সশস্ত্র সংগ্রামের পথই একমাত্র পথ নয় বলে ঘোষণা করেন এবং অহিংসার পথে সংগ্রামে আস্থা স্থাপন করেন গান্ধীজীর কাছে।

এই সময় রাজন্যবর্গ শাসিত অঞ্চলেও প্রজা আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। ত্রিপুরারাজ্যেও "প্রজা মন্ডল" (সংগঠনের নাম) তার নিজ পরিমন্ডলে এবং গণ-পরিষদ (অন্য একটি সংগঠন) এক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গড়ে ওঠে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রিয়াংদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে—বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবের দরুণ। লবণ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। ফলে এই গণ অসন্তোষ রতনমুণি রিয়াং-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। নির্মম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিদ্রোহের নেতা বলে বর্ণিত রতনমণি মহারাজার আম-দরবারে নির্মমভাবে নিগৃহীত হয়। তাঁকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁর নির্মম হত্যাকান্ড স-পরিষদ মহারাজার নিষ্ঠুর ভূমিকার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই পরিবেশের মধ্যেও গণ-অসন্তোষ বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। কৃষক সভার কাজ প্রায় স্তিমিত হয়ে গেলেও সারা ভারত কৃষক সভার নেত্রকোণা অধিবেশনে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতির এক বাস্তব নিদর্শন তুলে ধরে। এই প্রতিনিধি দল গঠিত হয়েছিল কমঃ বীরেন দত্তের নেতৃত্বে। দলে ছিলেন নিমাই দেববর্মা (বংশীবাদক) সাহানা সেন চৌধুরী (সেনগুপ্তা), বিরাজ সিং, ঝুনু সেনগুপ্তা, মাধব সিং, সুনীতি দত্ত প্রমুখ।

এ ছাড়া ধর্মনগর হিতসাধনী সভা এবং প্রজামন্ডলের পাশাপাশি প্রজা-পরিষদ তাঁর প্রভাব এ রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখে।

১৯৪৬ সালে নাগা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের জাতিসত্ত্বা বোধের সূচনা দেখা যায়। বিশেষ করে শিক্ষা প্রসারের প্রবল আকাঙ্খা শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

ত্রিপুরা রাজ্যের দৃশ্যপটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পূর্বে বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আর্থ-সামাজিক-পরিবর্তন সূচিত হয়। যুদ্ধ উদ্ভুত সংকট জন-জীবনে নিয়ে আসে চরম দুর্ভোগ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সমাজের উচ্চস্তরে এবং আমলা কর্মচারীদের এক অংশের মধ্যে চোরাকারবারের প্রভাব এবং একই সাথে ব্যবসায়ী ও মহাজনের শোষণ সীমাহীনরূপ পরিগ্রহ করে। লক্ষ্যনীয় ছিল যে এ রাজ্যে যে সমস্ত ভোগ্যপণ্য ও বস্ত্র সামগ্রী যা কিছু নির্দিষ্ট ছিল সবই একদল পরাক্রমশালী ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের যোগসাজসে সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে চলে যেত।

বনিক-পুঁজির অনুপ্রবেশ গ্রামগঞ্জেই নয় পাহাড়ী এলাকায়ও সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ করে এবং স্ব-নির্ভর কুটির শিল্পের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব ধ্বংস করে ফেলে। যুদ্ধের সময় গঠিত ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন ভেঙে দেওয়ায় ত্রিপুরী সাম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ,

যুদ্ধ শুধু ধ্বংসই নিয়ে আসেনি রাস্তা-ঘাটের প্রসার, বিভিন্নস্থানে সেনা-বাহিনীর ছাউনি, সৈনিক হিসাবে সৈন্যদলে অনেক ত্রিপুরীদের যোগদান উপজাতিদের জীবন যাত্রার আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। নিজেদের সনাতন আচার পদ্ধতি ও কুসংস্কার বর্জনের আন্দোলন গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। তা ছাড়া সৈনিকদের জীবন যাত্রার মানের ছন্দপতন ঘটায় তাদের মধ্যেও নব চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেনিক জীবনের নিয়ম নিষ্ঠা, জীবন যাত্রার এক নতুন উচ্চতম ধারা তাদের মানসিক বিকাশ ও রূপান্তরে সাহায্য করে। বিভিন্ন জাতি থেকে আসা অনেক সৈন্যের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে তাদের। ফলে জীবনযাত্রায় এক নতুন উন্নতমান ও চলমান নতুন দুনিয়া তাদের দৃষ্টি পথে ভেসে উঠে। কিন্তু সৈনিক জীবনের হঠাৎ পরিসমাপ্তি এবং আবার সেই পূর্বের জীবনযাত্রায় ফিরে এসে তারা বুঝতে পারল এবং উপলব্ধি করল— নিজেদের জীবনযাত্রা কি অবর্ণনীয় যন্ত্রণাদায়ক। এই বেকার সৈন্যরা জন-জীবনে এক বিরাট প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে সমাজ বিবর্তনের আন্দোলনেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সৈন্যদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও দু'চারটি কথা বলতে হয়, রাজানুগত্যের ভিত্তিতে গড়া ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন রণাঙ্গনে -এর মূল ফ্রন্ট বার্মা যুদ্ধে তাদের লিপ্ত হতে হয়। স্বভাবতই আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ দেশাত্ব-বোধ, তাদেরও মনে দাগ কাটে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সাথে তাদের মেলা মেশা নিজের জাতি ও দেশের তুলনামূলক বিচার স্বভাবতই সিপাইদের মনে এক নব-চেতনার উন্মেষ ঘটে। বার্মা-রণাঙ্গনে যুদ্ধে জাপানী সৈন্যের মুখামুখি হবার সুযোগে যুদ্ধের বিভীশিখাও তাদের মনের উপর দাগ পড়ে। তার পর পরাজয়ের গ্লানিও পরবর্তী সৈন্য বাহিনী যখন ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল তখন ভারতব্যাপী চলছে আন্দোলনের তীব্রতা এবং ত্রিপুরাতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের আহ্বান তাদের মনে নাড়া দেওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। এবং জনশিক্ষা আন্দোলন যখন উপজাতিদের সামগ্রিক অর্থে আন্দোলন নিয়ে এল তখন সৈন্যরা নিজের জনজাতির পাশে এসে দাঁড়াল, দেখা যায় পক্ষান্তরে প্রতিরোধ আন্দোলনে তারাই ছিল সংগ্রামের পুরোভাগে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে এই রাজ্যের রাজনীতির সাথে যুক্ত হবার সুযোগ হয় এবং পরিস্থিতির মোটামুটি বিশ্লেষণ ও বন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ার কাজে প্রেরণা পাই ও কাজ শুরু করি।

আমরা প্রথমেই সচেষ্ট হই কম্যুনিষ্ট ভাবধারা প্রসারের সব রকম উপায় উদ্ভাবনের। মনে রাখতে হবে তখন কম্যুনিষ্ট পরিচিতি কাজ করার পক্ষে নানাদিক থেকেই অসুবিধার কারণ ছিল। প্রথমতঃ রাজ শাসনের সামন্ততান্ত্রিক একনায়কত্ব ও অ-গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের চিন্তাধারা ছিল সেকেলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং গতিহীন রুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অ-রাজনৈতিক ও সামন্ত শাসনের ভয় ভীতি। আমাদের মুক্তি পাবার পূর্বেই স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং কম্যুনিষ্ট ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত কয়েকজন যুবক ও যুবতী এ রাজ্য থেকে নির্বাসিত হন। এদের মধ্যে ছিলেন বর্তমানে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত শ্রীমতী কানু সেনগুপ্ত (সুখরেন্দু সেনগুপ্ত), শ্রীমতী পূর্ণিমা সেন চৌধুরী, শ্রীমতী বীণাপানী দত্ত ও শ্রীমতী পান্না দত্ত। জেলেও ছিলেন অনেকে। যেমন, শ্রী শচীন্দ্র লাল সিং, তড়িৎ মোহন

দাশগুপ্ত, সুখময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। বীরেন দত্তও ছিলেন। তবে তিনি মুক্তি পেয়েই কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ার কাজে লেগে যান।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হতো এবং সংগঠনের গোপনীয়তা বজায় রেখে এবং স্বীকৃত সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করতে হত। এছাড়া গণ-সংযোগের বিভিন্ন পন্থাও আমরা আয়ত্ত্ব করতে সচেষ্ট থাকতাম। এমন কি ব্যক্তিগত সম্পর্কও যেখানে বৃহত্তর শোষিত জন-গোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করবে বলে আমরা মনে করতাম, সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করতাম আমরা।

পরিকল্পিত ভাবে সংগঠনের প্রাথমিক স্তর আমরা অতিক্রম করি ১৯৪৬ সালে। ঐ বছর মাঝা-মাঝি সময়ে গড়ে উঠে ত্রিপুরা রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম ইউনিট-কুমিল্লা জেলা-সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে। এই ইউনিটের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং সভ্য ছিলেন বীরেন দত্ত, জীতেন দত্ত, শান্তি দত্ত ও কতিপয় যুবক।

আগরতলা শহর ছাড়া কৈলাশহর ও সোনামুড়াতে দু'এক জন কমরেড্ ছিলেন। কৈলাশহরে ছিলেন বৈদ্যনাথ মজুমদার ও প্রয়াত রাসবিহারী দে। কমরেড্ বৈদ্যনাথ মজুমদার পরবর্তী সময় এ রাজ্যের রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং এখনও করছেন। সোনামুড়াতে ছিলেন নিরঞ্জন সেন। পার্টি গঠনের কাজে তার অবদানও কম ছিল না।

সংগঠনের এই পর্যায়ে আমাদের প্রথম প্রয়াস পার্টির মুখপত্র (পার্টি ওরগান) প্রকাশ করা। এ জন্য আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তির সবটুকুই নিয়োজিত করে সংগঠন প্রসারে কাগজের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করি। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৪৬ সনে 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' পার্টির মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই কাগজ সঙ্কলনের কাজে কমঃ বীরেন দত্তের ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এই সাপ্তাহিক আমরা রীতিমত ভাবে প্রকাশ করে চলি সে কথা আজ কল্পনার অতীত। অর্থের কথা বাদ দিলেও ছাপাখানার সমস্যা ছিল খুবই জটিল। স্বভাবতঃই দু'চারটি প্রেস যাও ছিল তারাও আমাদের কাগজ ছাপাতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করত না। তবুও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় 'আঞ্জুমান' প্রেস ও ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেসের কথা। তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে কাগজ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হত। এ কাজে অন্য যাদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কথাও আমাদের মনে পড়ে—বিশেষ করে প্রয়াত রাজেন দে এবং প্রয়াত ধীরেন দত্ত। রাজেন দে যে কতভাবে সাহায্য করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। প্রয়াত ধীরেন দত্তের ছিল দু'টি দোকান। এই দুটি দোকান ঘর ছিল আমাদের কাগজের গোপন অফিস, এখানে বসেই আমরা সব কাজ সম্পন্ন করতাম। এইভাবে কতিপয় লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি কমঃ বীরেন দত্তের কঠোর পরিশ্রম ও অন্য সমস্ত রকম বাধা বিপত্তি অপসারণ করে আমরা কাগজ শুধু চালিয়েই যাইনি, এ কাগজের প্রচারেও বিঘ্ন ঘটাতে দিই নি।

পত্রিকায় প্রকাশ হ'ত বিভিন্ন স্থানে সরকারী নির্যাতনের কাহিনী। উপজাতিদের দুরবস্থার কথা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতির উপর সমালোচনা মূলক লেখা। আমরা নিজেরাই ছিলাম লেখক, রিপোর্টার ও প্রচারক। রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য আমরা বিভিন্ন স্থানে ও ছোট শহরগুলোতে ভ্রমণে যেতাম এবং সেটা একদিকে যেমন খবর সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন লোকালয়ে যাওয়ার

সুযোগ এনে দিত তেমনি বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে যাবার চেষ্টাও থাকত। রাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তিগুলিকে এক সংগঠনের মধ্যে টেনে এনে একত্রিত করবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাতাম।

১৯৪৬ বা ১৯৪৭ সলে কমলপুরে ভীষণ গো-মড়ক শুরু হয়। ত্রিপুরীদের মহিষ ছিল প্রধান গৃহপালিত জন্তু। এই ব্যাপক মড়কে ত্রিপুরী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ব্যাপারে আমরা কাগজের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হই। এবং আমাদের পার্টির কর্মী রণজিৎ সেন ছিলেন তখন পশু ডাক্তার। তিনি তখন অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে মড়ক নিবারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

এ ছাড়া ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরাতে পাহাড়ী অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময়ে আমরা ফটিকরায় বেশ কিছু দিন অবস্থান করে সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি। দুর্ভিক্ষ নিবারণে এবং উপজাতিদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য কতকগুলো কার্যকরী পন্থা সরকারের কাছে পেশ করি। তন্মধ্যে প্রধান ছিল উপজাতিদের নামেই গাছ ও বাঁশ, ছন কাটার বিনা পয়সায় পারমিট বিলি করা (উদ্দেশ্য ছিল এই পারমিটগুলো উপজাতিরা পাহাড়ীয়ারা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে কিছু আয় করবার সুযোগ পাওয়া।) ২। বিনা পয়সায় চাল সরবরাহ— এটাও করা হয়েছিল মন্ত্রী ব্রাউন সাহেবের নির্দেশে।

এ সময় আমরা কৈলাশহরে অনেক দিন অবস্থান করি এবং সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সংগ্রহ করে (বিশেষ করে বন-বিভাগের কর্মীদের বিরুদ্ধে) পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকি। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে সরকারের উর্দ্ধতন মহলে কিছুটা পরিমাণে সাড়া জাগাতে আমরা সমর্থ হই।

মোট কথা সরকারী আমলাদের প্রজাদের উপর নির্যাতনের কাহিনী, সামাজিক অবস্থার জটিল সব সমস্যা সমূহ এবং বিশেষ করে উপজাতিদের কাছে নির্যাতনের কাহিনী এবং তাদের মধ্যে জাতি সচেতনতার উন্মেষের বিশেষ দিকগুলো আমরা জন সমক্ষে তুলে ধরতে চেষ্টা করতাম। তারপর স্থান পেত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতির জটিল অবস্থার বিশ্লেষণ, ভারত ভুক্তির জন্য জনমত গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা এবং কার্যকরী ভাবে প্রশাসনিক কাজকর্মে গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশ ও প্রয়োগের জন্য জনমত গড়ে তোলবার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রবন্ধ।

আমাদের ভ্রমণের সময় কমরেড্ বীরচন্দ্র দেববর্মা ছিলেন সকলের অগ্রণী। তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে কাঞ্চনপুর, ধূমাছড়া, ময়নারমা প্রভৃতি স্থানে সংযোগ স্থাপন করেন। তাছাড়া ধর্মনগরে হিতসাধনী সভার সাথে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদের আলোচনা ও ঐক্যমত ঐ সময়ের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন গড়ার জন্য আমাদের কাজ ছিল বহুমুখী। পত্রিকা প্রকাশ এবং তার মাধ্যমে জনমত গঠন যেমন ছিল এক ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা তেমনি সভা সমিতি গঠন ও ঘরোয়া বৈঠকও ছিল আমাদের কর্মসূচীর এক প্রধান অঙ্গ। এই সময়ই আমাদের প্রচেষ্টা ছিল এক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের। প্রয়াত হরিদাস চক্রবর্তী, বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায় প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন এই কাজে আমাদের সহযোগী। তাছাড়া প্রজামন্ডলের সাংগঠনিক কাজ এবং এই সার্বজনীন সংগঠনের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপক অভিযানে ছিলাম আমরা প্রধান
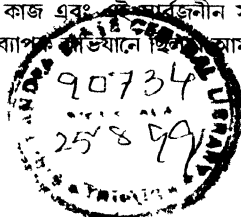
উদ্যোক্তা। বলতে বাধা নেই এই সংগঠনের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা ছিল আমাদেরই। প্রভাত রায়কে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রজা আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তুলতে সদরের বিভিন্ন স্থানে এবং মফঃস্বলে অনেক স্থানে মিটিং করি এবং যথেষ্ট সাড়া পাই। আমাদের বক্তব্য থাকত ভারতভুক্তি সম্পর্কে এবং এই রাজ্যে শাসন ব্যবস্থায় গণ-তান্ত্রিক কাঠামোর প্রবর্তন প্রসঙ্গে। এই আন্দোলনের ফল স্বরূপ মহারাজা এক মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। এই মন্ত্রী পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়ায় সংকট দেখা দিলে আমরা আমাদের পত্রিকা মারফৎ সর্বদলীয় মন্ত্রী সভা গঠনের আহ্বান জানাই। স্পষ্ট মনে পড়ে এই দাবী মানুষের মনে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্য তখন ভিতরে ও বাইরে আক্রমণের মুখে। এমন অবস্থায় আমরা মনে করি রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হবার সামিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি (আঞ্জুমান ইসলামিয়া) পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির জন্য এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সংগঠিত মিছিল পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে শহরের বুকে অবলীলাক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে। মনে রাখা দরকার এই রাজ্য তখন রিজেন্ট শাসিত এবং তাঁর অধীনে দিল্লীর নিযুক্ত এক দেওয়ান অধিষ্ঠিত থেকে রিজেন্ট -এর শাসন কার্য পরিচালনা করতে সাহায্য করতেন। এই সময়ে মুসলীম সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে যোগ হয়েছিল স্যাংক্রাক বাহিনী। এরা ছিল বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের অগ্রগামী বাহিনী। ঠাকুরলোক ও কর্তাদের এক অংশের পৃষ্ঠপোষকতার বর্দ্ধিত ও তাদের সমর্থন পুষ্ট। মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে মিলিত হয়ে এরা একযোগে ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং উগ্র-জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালী হিন্দুদের এ রাজ্য থেকে বিতারণের আওয়াজ তুলে। এ অবস্থায় সমস্ত প্রগতিশীল দল ও লোকদের একত্র সমাবেশ করে এই সংকটের মোকাবিলা করতে আমরা সচেষ্ট হই। আমাদের ডাকে এই সময় বহু সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ এক বিশাল জমায়েতে প্রয়াত অম্বিকা চক্রবর্তী ভাষণ দেন। এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল উমাকান্ত স্কুল ময়দানে।

রতনমণির মৃত্যুকে স্মরণ করে আমরাই প্রথম তাঁকে দেশপ্রেমী ও একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বলে আখ্যায়িত করি।

এছাড়া পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধ বিক্রি ছিল আমাদের একটি বড় কাজ। আমরা শুধু কাগজ বিক্রিই করতাম না, মাঝে মাঝে গ্রাহকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থাও করতাম। এছাড়া থাকত আমাদের পরিচালনায় রাজনৈতিক পাঠচক্র। সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশে সাহায্য করতে আমরা মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও সংগঠিত ও পরিচালনা করতাম। এ কাজের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে অনেক যুবক যুবতী আমাদের সংস্পর্শে আসেন। যার মধ্যে ছিলেন প্রথিত যশা কবি ও সাহিত্যিক প্রয়াত মণিময় দেববর্মা ও শ্রী মহেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে পার্টিকর্মী ও সংগঠক বেড়ে চলল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আতিকুল ইসলাম, কালা মিএগ প্রভৃতি। আমাদের অনুষ্ঠিত নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালচারাল স্কোয়ার্ড নিয়ে আমরা শিলচর শহরেও গিয়েছিলাম। এই স্কোয়ার্ড -এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রয়াত মণিময় দেববর্মা। সঙ্গে ছিলাম আমি ও আরও কয়েকজন কমরেড্।

উল্লেখযোগ্য হ'ল কমঃ মহেন্দ্র দেববর্মা।

আমরা শুধু আদর্শগত সংগ্রামেই লিপ্ত থাকতাম না। জন জীবনের সাথে যে সমস্যা যুক্ত এরকম সব কাজেই আমরা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। যেমন ধরা যাক ১৯৪৬ সনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ যারা ত্রিপুরায় বিশেষ করে আগরতলায় এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল আমরা সে সমস্ত পরিবারবর্গকেসাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলাম। পরিষ্কার মনে পড়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দণ্ডিত একদল বন্দী মুক্তি পেয়ে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। আমি তাঁদের সাথে চাঁদপুরে মিলিত হয়ে চট্টগ্রাম যাই। তাঁদের সাথে জালালাবাদ সহ বিভিন্ন গ্রামেও যাই। দেখেছি হিন্দু মুসলমানের কি বিরাট সম্প্রীতি চট্টগ্রামে ও তার আশে পাশে গ্রামগুলিতে। পরিষ্কার মনে পড়ে জালালাবাদ থেকে ফেরার সময় একটি চলন্ত গাড়ীর নিচে পড়ে এক মুসলমান যুবকের মৃত্যু ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা। কিন্তু সে দিন দেখেছিলাম হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় সে উত্তেজনা কি সুন্দরভাবে প্রশমিত হয়েছিল। কিন্তু দু'চার দিন পর সংবাদ এসে পৌঁছল নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। আমরা তখন নোয়াপাড়া পরিভ্রমণ করছি (নোয়াপাড়া অম্বিকা চক্রবর্তীর নিজ গ্রাম)। সেখানে বহুলোক হতাহত হয়েছে, বহুলোক নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ কুমিল্লা হয়ে আগরতলায় চলে আসি। কুমিল্লা থেকেই রেড্-ক্রস্ থেকে কম্বল ও দুধ নিয়ে আসতে সমর্থ হই। আগরলতায় পৌঁছে ত্রাণ কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের কমরেডদের নিয়ে একযোগে। আমরা এ সময় আগরতলায় পি আর সি-র তত্ত্বাবধানে একটি ডিসপেনসারী ও একটি সাময়িক হাসপাতাল উদ্বোধন করি ও সব সময়ের জন্য নিয়োজিত ডাক্তারের অধীনে সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করি। এই পি. আর. সি. সংগঠন ও তাঁর কর্মীদের, বিশেষ করে কমঃ রণজিৎ সেনের অবদান পার্টির ভূমিকাকে জনসাধারণেব কাছে তুলে ধরতে সাহায্য করে। পরবর্তী সময়েও বিশেস করে গোলাঘাটি ঘটনার অব্যবহিত পরেও পি. আর. সি. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রিলিফের কাজে শুধু আমরাই আত্মনিয়োগ করি নি, অন্যরাও বিশেষ করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকেও শচীন্দ্রলাল সিং ও প্রয়াত হরি কর্তার তত্ত্বাবধানে রিলিফ ওয়ার্ক'করা হয়। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে আগত উদ্বাস্তুরা আশ্রয় খুঁজে নিতে সমর্থ হয়।

১৯৪৭ সনে পাহাড়ী এলাকায় বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে রিয়াংদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ভীষণ আকার দেখা দিলে রিয়াংরা অনেকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত ফটিকরায়ের কাছাকাছি এলাকায় রিয়াং ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতিরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা তদানীন্তন মন্ত্রী ব্রাউন সাহেবকে বাধ্য করি দুর্গতদের সাহায্য করতে এবং কতকগুলো সুবিধা দিতে। সুবিধার মধ্যে বিশেষ ছিল বিনা মাশুলে গাছ কাটার অনুমতি পত্র। একাজে উপজাতিদের পরিমিত সাহায্য না হ'লেও মোটামুটিভাবে অর্থের সংস্থান হয়।

ব্যক্তি সম্পর্ক

বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক ছিল একটি ফলপ্রসূ কার্য্যক্রম ; আমাদের পরিকল্পিত কর্মধারার একটি অঙ্গ। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় প্রয়াত অমরেন্দ্র দেববর্মা (বংশী ঠাকুর) ও প্রভাত রায় প্রসঙ্গে। তাছাড়া প্রয়াতঃ যোগেশ দেববর্মা ও প্রয়াত হরিদাস চক্রবর্তী এরা ছিলেন আমাদের হিতৈষী এবং ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা। যখন স্যাংক্রাক আন্দোলন এ রাজ্যে দানা বেঁধে উঠে তখন এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বংশী ঠাকুর ও প্রভাত রায়। কত রকম ভাবে এঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। স্যাংক্রাক আন্দোলন সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জাতীয় সচেতনতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি— কিন্তু উগ্রজাতীয়তাবাদবোধ সব সময় নিন্দনীয়। স্যাংক্রাক সংগঠন ছিল এমনি একটি উগ্রজাতীয়তাবাদী সংগঠন। এবং এর পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন রাজকুমার দুর্জ্জয়কিশোর দেববর্মা এবং কিছু মুসলিম ফানডামেন্টালিষ্ট দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ; যারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্তির জন্য।

এই পরিস্থিতির মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল প্রজামন্ডল। এই সংগঠন গড়ে তুলতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করি। প্রজামন্ডল গড়ে তুলতে এবং তার পক্ষে প্রচার ও সক্রিয় আন্দোলনে তাদের অংশ গ্রহণ আমাদের মূল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ১৯৭৬ সনে আমরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে প্রয়াসী হই। এই কাজেও বংশী ঠাকুর ও প্রভাত রায়ের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ছিল অনস্বীকার্য। এ ছাড়া আর যাদের নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন গোপী লস্কর। এদের ছাড়া মফঃস্বলেও বহু প্রভাবশালী লোক আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন কৈলাশহরে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি কীর্তি সিং ও তাঁর ছেলেরা, অমর সিং ও তার ভাই আর তাছাড়া বিমল দেব, অজিত ভট্টাচার্য প্রমুখ। ধর্মনগরের হিতসাধিনী সভা ও আরও অনেকে। উদয়পুরে ছিলেন বাদশা মিঞা এবং সোনামুড়ার উপেন্দ্র লস্কর এবং ঐ সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিছু কিছু রাজ কর্মচারীও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ভবিষ্যতে এদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে ওঠে।

এই সমস্ত কাজের মধ্যেও সুযোগ ঘটলেই আমরা পাহাড়ী এলাকায় যেতে শুরু করি। এই সফরগুলো আমাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এই এলকাগুলোর মধ্যে টাকারজলা, পেকুয়ারজলা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের মধ্যে দিয়ে কিছু লোকের সাথে আমাদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ত্রিপুরা বোর্ডিং -এ ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা পূর্বেই শুরু হয়েছিল এবং এ কাজে আমাদের ভূমিকার কথা সবিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এই সমস্ত ছাত্রদের মাধ্যমে পাহাড় এলাকায় সংযোগ রক্ষা করে বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ঘটে।

আমরা যে দৃষ্টিতে উপজাতিদের সমস্যা বিশ্লেষণ করি তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এক তীব্র সঙ্কট ঘণীভূত হয়ে উঠছে। তদুপরি সদা যুদ্ধ ফেরতা সৈনাদের গ্রামে প্রত্যাবর্তন উপজাতি জীবন যাত্রার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে। সৈনিকদের জীবন যাত্রার মানে (স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং) ছেদ পড়ে যায়। ফলে দেখা দেয় তীব্র অসন্তোষ। বেকার জীবনের তীব্র অনুভূতি। মহাজন ও ব্যাপারীদের তীব্র শোষণ জন জীবনে সৃষ্টি করে চাপা অসন্তোষ। এ ব্যাপারে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ সমস্ত দিক থেকে আমাদের সমস্যার গভীরে যেতে সাহায্য করে। ঘটনাটি ঐতিহাসিক এবং উল্লেখের দাবী রাখে। ছোট ঘটনা কিন্তু বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে সমস্যার স্বরূপ কত কঠিন। ঘটনাটি ঘটেছিল আমি যখন একবার পেকুয়াজলা যাই তখন। এক বৃদ্ধ উপজাতি (ত্রিপুরী) আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পারে যে আমি একজন বাঙ্গালী তখন সে দুঃখের সাথে বলে 'বাঙ্গালীরা সব চোর'। আমি প্রতিবাদের সুরে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম এই অভিমতের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে সে আমাকে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা জেনেছে ও যে ব্যবহার পেয়েছে সে খুব সুন্দরভাবে বলে গেল সামান্য অতিরঞ্জিত না করে। মহাজন, ব্যবসায়ী, আমলা কর্মচারী, উকিল সকলেই বাঙ্গালী এবং এরা সকলেই কিভাবে উপজাতিদের সর্বক্ষেত্রে শোষণ করছে— সেই কাহিনীই সে আমার কাছে বর্ণনা করল। আর এ ছিল উপজাতিদের জীবনের এক বাস্তব সত্য।

এই রূঢ় বাস্তবকে আমি আমাদের কাগজে একটি রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশ করার সাথে সাথে তার প্রতিক্রিয়া ভীষণ ভাবে লক্ষ্য করা গেল সরকারের কঠোর মনোভাব ও কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। আমাদের কাগজের সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত হ'ল। আমাকে রাজদরবারে ডেকে পাঠান হল। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকেও রেহাই দেওয়া হল না। পুত্রের এই সত্য প্রকাশের জন্য প্রশাসনের উপর যে আঘাত হানা হল— সেটা তো মহারাজার উপরই আঘাত।

রাজদরবারের ভয়াবহ সে দৃশ্যের বর্ণনা দিতে চাই না। রাইফেল ও টমিগান হাতে সারি দেওয়া শাস্ত্রীদল , এক নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। মহারাজ স্ব-আসনে উপবিষ্ট, পার্শ্বচরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে। পাইক বরকন্দাজরা মদের গ্লাস হাতে সদা প্রস্তুত। মদ্যপানে আবিষ্ট ঢুলু ঢুলু চোখ—এক ভয়াবহ নারকীয় দৃশ্য। ভয় হওয়াটা স্বাভাবিক। এই পরিবেশ যেন সেই ভয় সৃষ্টি করার জন্যই করা হয়েছিল, কিন্তু মহারাজার উক্তিতে বুঝলাম যে রাজশক্তি কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎরূপ কল্পনা করে ভীত ও সন্ত্রস্ত।

মহারাজ নিজের শক্তি পরিমাপ করে উঠতে পারছিলেন না। তিনি নিজেই প্রকাশ করলেন তার দুর্বলতা। রাজবংশের প্রাচীন গৌরব গাঁথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি যেন এই প্রাচীন রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটাতে সচেষ্ট না হই।" আমি নীরবই ছিলাম, কেননা এই পরিবেশের মধ্যে কোন্ রকম আলোচনা অর্থহীন বলেই আমার মনে হয়েছিল।

উপজাতিদের মধ্যে এইভাবে ধীরে ধীরে সংযোগের মধ্য দিয়েই আমরা তাদের মধ্যে ও তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হই— যা পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে

তোলার অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিল। ক্রমে ক্রমে শহরে শুধু বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যেই আমাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকেনি, শহরে দেববর্মা (ঠাকুর লোকদের) সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরী বোর্ডিং -এর ছাত্রদের মধ্যে যারা এসময়ে সংস্পর্শে আসে তাদের মধ্যে নীলমণি দেববর্মা (পরবর্তীকালে বিশিষ্ট চিকিৎসক) অঘোর দেববর্মা ও ধর্মরায় প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ। এছাড়া কমঃ সুধন্ব দেববর্মা (পরবর্তীকালে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, লেখক ও শিল্পী) সাথেও আমাদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার কথাও মনে পড়ে। বীরচন্দ্র দেববর্মার (বিশিষ্ট আইনজীবী) সাথেও আমাদের যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। পরবর্তীকালে এদের সকলের অবদান পার্টি গড়ার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

পার্টির বুনিয়াদ একটু শক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আমরা পার্টি অফিস উদ্বোধন করবার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করলাম। এ কাজে কৃতকার্য্য হ'লাম অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্যে। এ কাজে যার সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি ছিল তিনি হ'লেন প্রয়াত রাজেন্দ্র দে (ওরফে রাজেন ডাক্তার), স্বাধীনতা সংগ্রামী দ্বিজেনদের বড় ভাই। তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যও ছিলেন। যুদ্ধের সময় ঠিকেদারী কার্যে লিপ্ত হ'ন এবং বহু লোককে বিশেষ করে যুবকদের অকৃত্রিম ভাবে সাহায্য করেন। শ্রদ্ধেয় রাজেনদা তাঁর বাড়ীতেই আমাদের অফিস ঘর তুলবার অনুমতি দেন। আগেই বলেছি প্রয়াত রাজেন ডাক্তার ছিলেন পার্টির সক্রিয় কর্মী। পরবর্তীকালে পার্টিকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে না পারলেও তিনি সব সময়ই পার্টির সাথে সংযোগ রক্ষা করতেন এবং নানাভাবে পার্টিকে সাহায্য করে গেছেন। তাঁর অবদান আমরা সব সময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

পার্টি অফিসের জন্য একটি নতুন ঘর তুলবার খরচ বহন করা আমাদের পক্ষে ছিল প্রায় অসাধ্য। এ ব্যাপারে এ রাজ্যের তৎকালীন নির্বাহী বাস্তুকার প্রয়াত অনিল সেনগুপ্ত আমাদের সাহায্য করেন। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমরা যখন প্রস্তাব রাখলাম একটি সরকারী পরিত্যক্ত ঘর আমাদের চাই ; নিলামের নাম করে সামান্য মূল্য ধার্য্য করে দিতে হবে। তখন তিনি বিনা দ্বিধায় রাজী হ'লেন এবং ঘরটির নাম মাত্র মূল্য ধরে আমাদের দিয়ে দেবার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। পার্টি অফিসের জন্য আসবাব পত্র (আলমিরা, চেয়ার ও একটি টেবিল) ও আমরা সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে সক্ষম হ'লাম। এ ভাবেই ১৯৪৭ সালে প্রথম দিকে পার্টি অফিসের উদ্বোধন হয়।

ইতিমধ্যে পার্টি তার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তি নিয়ে আন্দোলন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলন, উপজাতিদের আত্মসচেতনতার জন্য আন্দোলনে পার্টি এক বিশেষ ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়। পার্টি সামগ্রিকভাবে প্রজামন্ডলের সাথে একযোগে কাজ করে এবং সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। প্রজামন্ডলের কথা ও সংগঠনের কথা বলতে গেলে গোপী লস্করের (গোপী দেববর্মা) কথা অবশ্যই মনে পড়ে। তাঁর বাড়ীতেই প্রজামন্ডলের অফিস খোলা হয়েছিল।

প্রজামন্ডল তার জন্মলগ্ন থেকেই ঠাকুর, বাঙ্গালী, মণিপুরী, ত্রিপুরী, বিভিন্ন উপজাতি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান রূপে এবং একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কাজ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন প্রয়াত যোগেশ ঠাকুর, বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায়, কমঃ বীরচন্দ্র দেববর্মা, গোপী লস্কর, গোপী দেববর্মা, হরিদাস চক্রবর্তী ও অন্যদিকে উদয়পুরে ছিলেন বাদশা মিঞা, কৈলাশহরে কীর্তি সিং, অমর সিং, বিমল দেব প্রমুখ এবং আরও অনেকে। এঁরা সকলেই এই সংগঠনের সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত থেকে আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বলতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়া পরবর্তীকালে ধর্মনগরে 'হিতসাধনী সভা' এবং ময়নামা অঞ্চলে মাধব মাষ্টার এই প্রজামন্ডলের সাথে মিলিত ভাবে কাজ করতে সম্মত হওয়ায় আন্দোলনের প্রভাব বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

প্রজামন্ডল সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আরও আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। কিন্তু তার পূর্বে জনশিক্ষা সমিতি সম্পর্কে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে কিছু বলা প্রয়োজন। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের মধ্যে যে আলাড়ন সৃষ্টি করেছিল তার গোড়া পত্তন হয় জনশিক্ষা সমিতির মাধ্যমে। শিক্ষা প্রসারের এই আন্দোলনেব ব্যাপকতাকে অনেকটা তুলনা করা চলে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাথে। সেখানে ছিল বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী বলশেভিক পার্টি-- বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তি জনগণের সোভিয়েট সমূহ এবং সে সঙ্গে তার পরিচালিত সরকার — সর্বহারায় একনায়কত্ব। কিন্তু এখানে যে উদ্যোগ তা উপজাতিদের মধ্যে জাতিসত্ত্বা বিকাশের চেতনা বোধের ও একই সঙ্গে তার উন্মেষের সুস্পষ্ট আগ্রহ ও নিজ বাসভূমে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ।

এই কাজে সবচেয়ে যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হলেন— বিপ্লবী নায়ক প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও তার সহযোগী সুধন্য দেববর্মা প্রমুখ কতিপয় দেশপ্রেমিক এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ত্রিপুরা বোর্ডিং -এর তৎকালীন ছাত্রবৃন্দ। সেই দিনে পাহাড়ে প্রায় প্রতিটি পাড়ায় স্কুল গড়ে তোলা, জনসাধারণের প্রচেষ্টায় শিক্ষার নিয়োগ এবং স্কুল গৃহ নির্মাণ এই সব কাজেই সুন্দরভাবে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল একমাত্র জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে। অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন পাহাড়ের অল্প শিক্ষিত উপজাতি যুবক। কম্যুনিষ্ট পার্টি এই কর্মযজ্ঞে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করেছিল সত্যি—কিন্তু এই কর্মযজ্ঞের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভাবে বুঝে উঠতে পারে নি বলে আমার বিশ্বাস।

এই জাতীয় চেতনার যে উন্মেষ ঘটেছিল তার সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। রণনৈতিক কৌশলের সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গণতান্ত্রিক অংশের সাথে তার যোগাযোগের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের গণতান্ত্রিক লড়াই -এ পরিণতি ঘটাবার বাস্তবতা সম্যক উপলব্ধি করার প্রয়োজন ছিল। তা হলেই এই আন্দোলন হতে পারত লেনিনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত এক বৈপ্লবিক সংগ্রাম। প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা। প্রয়োজন ছিল উপজাতিদের আন্দোলনকে গণ-তান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার এবং পাহাড়ী ও সমতলবাসী কৃষক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের।

কিন্তু আমরা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই এই কাজের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তুলতে পারিনি।

কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি এই কর্ম যজ্ঞে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করেছিল এবং এই সহযোগিতার পরিণাম স্বরূপ উপজাতিদের সাথে পার্টির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা এত বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল যে তদানীন্তন সরকারও কিছু কিছু স্কুলের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ত্রিপুরার গ্রাম গঞ্জে স্কুল গড়ে উঠার মূলে ছিল শিক্ষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি। উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, উপজাতিদের মধ্যে জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা আন্দোলন ছিল এক মূল উপাদান এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতির পটভূমি। শিক্ষা আন্দোলনের সাথে পাহাড়ী জীবনে নিয়ে আসে তার সংস্কৃতির বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ।

উদ্বেলিত ত্রিপুরা রাজ্যের পটভূমিতে পার্টির ভূমিকা যে কত সঠিক ছিল এ কথা বলার জন্য প্রজামন্ডল ও জন-শিক্ষা সমিতি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত। পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের অন্যান্য দিকগুলি খতিয়ে দেখা যাক। ত্রিপুরা রাজ্যের পার্টি ইউনিট ত্রিপুরা জেলা পার্টির নেতৃত্বে কাজ করেছিল। আগরতলা থেকে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জিলা পরিষদে দু জন কমরেড নির্বাচিত হয়েছিল। এই দু'জন হলো কমঃ বীরেন দত্ত ও কমঃ দেবপ্রসাদ সেন। ত্রিপুরা জিলা পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন কমঃ সুবোধ মুখার্জি। নেতৃস্থানীয় কমরেডদের মধ্যে ছিলেন কমঃ ভানু ঘোষ, যোগব্রত সেন, ফণি মজুমদার, কান্তি সেন প্রমুখ পার্টির নির্দেশে আমরা আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়ে পার্টির সামগ্রিক কার্যক্রম রূপায়ণে চেষ্টা করেছি। যখন যে নির্দেশ এসেছে তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করেছি। যদিও এই সাংগঠনিক ব্যবস্থায় কুমিল্লা জেলা পরিষদের পক্ষে ত্রিপুরার সমস্যা সমূহের মূল্যায়নে মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা সক্ষম হনি এবং বিশেষ করে ত্রিপুরা উপজাতি সমস্যা বুঝবার কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় নি। তবুও কেন বলতে পারি না এ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি হয় এবং এও সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যে কম্যুনিষ্ট সংগঠন স্বাধীনভাবে তার বিপ্লবী ভূমিকা পালনে এবং জাতি সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ হয়।

আমাদের মনে হ'ত কুমিল্লা পার্টিরও গণসংযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং একমাত্র বড়ুরা অঞ্চল ছাড়া পার্টি কোন স্থানেই তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, আর সে চেষ্টাও ছিল না। পার্টি শহরাঞ্চলে কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকের মধ্যে যেন একটা রোমান্টিক ভাবধারা নিয়ে কাজ করে চলছিল। জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এ ছিল এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। এ সত্য আরও প্রকট হয়ে উঠে এ, বি রেলওয়ে কেন্দ্রে সংগঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং সার্বিকভাবে ১৯৪৬ সনে বাংলাদেশে এসেম্বলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনের কাজের মধ্য দিয়ে।

১৯৪৬ সনে আগরতলা এ, বি, রেলওয়ে কেন্দ্রে কমঃ জ্যোতি বসুর পক্ষে কাজ করবার দায়িত্ব পাই। আমার কাজ ছিল আখাউড়া জংশনে রেলওয়ে কর্মীদের মধ্যে প্রচার কাজ করা। এ

[illegible] কমরেডদের সহযোগিতায় করতে হয়। সে সময় আখাউড়াতে আমাদের সংগঠন না থাকতে আমাকে আগরতলা থেকে রোজ সাইকেল যোগে যাতায়াত করে কাজ করতে হ'ত। সংগঠনের দুর্বলতার জন্য আমাদের খাবারের স্থান পর্যন্ত ছিল না। তবু প্রত্যহ শ্রমিকদের বস্তিতে গিয়ে আমরা প্রচার কার্য চালিয়ে যাই। যতদূর মনে পড়ে এই কেন্দ্রে কমঃ জ্যোতি বসুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হুমায়ুন কবির। এরপর বাংলাদেশের নির্বাচনে আমরা কুমিল্লা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রার্থী ছিলেন কমঃ ইয়াকুব মিঞা ওরফে বড় মিঞা। এই কাজে পার্টি সমস্ত শক্তি নিয়ে ইয়াকুব মিঞার পক্ষে প্রচার কার্যে তৎপর হয়। কুমিল্লা পার্টি ইউনিটের সহযোগী হিসাবে আগরতলা ইউনিটও পূর্ণ উদ্যম নিয়ে কাজ করে। আমরা কুমিল্লা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কমরেডদের একযোগে কাজ করি। তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছি কুমিল্লার সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে পার্টি সংগঠন কত দুর্বল। কোন গণসংগঠন বিশেষ করে কৃষক সভা বা অনুরূপ কোন সংগঠন না থাকাতে আমাদের যথেষ্ট প্রচার সত্ত্বেও আমরা ভোটারদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারিনি। ফলে মুসলিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে না পেরে তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছি। কুমিল্লার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভোট কেন্দ্রে বহু স্থানে আমাদের এজেন্টরা ঢুকতে পারেনি। পোলিং অফিসাররাও আমাদের নিরাপত্তার জন্য মুখ খুলেন নি। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেই ভোটকেন্দ্রে গেছেন। অনেক কর্মীকে কিডনেপড্ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। একটি ঘটনার সাথে আমি নিজেই জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। গোমতী নদীর অপর পারে (উত্তর) তিন মাইল দূরবর্তী এক বুথে আমি পোলিং এজেন্ট হিসাবে থাকব বলে সিদ্ধান্ত হয়। সকালে যথাসময়ে রওনা হয়ে নদী পার হওয়ার পরই অদূরবর্তী একটি স্থানে আমি আক্রান্ত হই। দুর্বৃত্তরা আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং আটক করে রাখে। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হয় তাদের নেতা; আমারই পরিচিত। কোন এক সময় সে আমার দ্বারা সামান্য উপকার পেয়েছিল। আমাকে দেখেই সে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিল আমাকে ছেড়ে দিতে এবং আমার গন্তব্যস্থানে যেতে কোন বাধা সৃষ্টি না করতে। এরপর আমি আমার গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হই এবং যথাসময়ে পৌঁছে পরিচয়পত্র দাখিল করে পোলিং এজেন্ট হিসাবে আমি আমার দায়িত্বভার গ্রহণ করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব এবং আমার নিজের নিরাপত্তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। মুসলিম লীগের কর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সেদিন যা দেখেছিলাম তা বর্তমান সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে — বিশেষ করে বর্তমানে ইলেকশনে একে রাজীব কালচার বলে অভিহিত করা যায়। পার্থক্য শুধু সময়ের ব্যবধান এবং আরও বেশী হিংসাশ্রয়ী তৎপরতা।

সন্ধ্যায় এক ভয়ানক হিংস্র ও উন্মাদ জনতার মধ্যে আমি স্বভাবতঃই এই দীর্ঘ পথ কিভাবে অতিক্রম করে পার্টি অফিসে যেতে পারি — এই কথা সেই বুথে বসে ভাবছিলাম। এমন সময় সাহায্যের হাত প্রসারিত করল একটি সাধারণ পুলিশ কর্মচারী। সে সেই বুথে কর্তব্যরত ছিল। সে-ই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল এবং পৌঁছে দিল থানারই ভারপ্রাপ্ত অফিসার অতুল গুপ্তের

বাসায়। যিনি ছিলেন আমার নিকট আত্মীয়। ফলে নিরাপদ আশ্রয় ও খাবারের বন্দোবস্ত সে রাত্রের জন্য ভালভাবেই হ'ল। পরের দিন সকালে পার্টি অফিসে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা বলার পর জানলাম অনেক বুথে এরকম একই ঘটনা ঘটেছে এবং একমাত্র বড়ুরা অঞ্চল ছাড়া সব স্থানেই মুসলিম লীগের জবরদস্তিমূলক আচরণ ও বে-আইনি ভাবে বুথ দখল ঘটেছিল। এরপর কয়েকদিন ধরে কুমিল্লা শহরের বুকের উপরই চলে কম্যুনিষ্ট বিরোধী জেহাদ এবং পার্টি অফিসের উপর আক্রমণ। অবশ্য শহরাঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও আমরা প্রতিরোধের বেষ্টনী গড়ে তুলি এবং অবস্থা আয়ত্বে আনতে সমর্থ হই। আজও দেখি গণসংযোগ না থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সম্মুখীন হওয়া সুকঠিন। এই শিক্ষা আজও আমরা গ্রহণ করিনি। ফলে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়া আজও সক্রিয়। এই শক্তি নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রগতি আন্দোলনের গতিরুদ্ধ করে চলেছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও ভাবধারার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম না চালিয়ে গেলে এই প্রগতিশীল শক্তি অবদমিত হবে না। পরবর্তী সময়ে এই সাম্প্রদায়িক শক্তি দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূল উপাদান হিসাবে কাজ করে এবং ফলে ভারতবর্ষ দ্বি-খণ্ডিত হয়।

নির্বাচনের প্রচার কার্যে কমঃ যোশী তখন এ অঞ্চলে এসেছিলেন এবং সেই সময় আখাউড়া রেলওয়ে জংশনে কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের সাথে আলাপ হয়। তার সঙ্গে ছিলেন বর্তমান প্রথিতযশা সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী। যিনি ছিলেন যোশীর সেক্রেটারী। এই সাক্ষাতের সময় কমঃ বীরেন দত্ত, কমঃ চন্দ্রশেখর দাস ও আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রয়াত চন্দ্রশেখর দাস তখন কুমিল্লা পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি নকশাল আন্দোলনে যোগ দেন এবং সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। কমঃ যোশীর সাথে আমাদের বিশেষ এক পরিবেশে ঘনিষ্টভাবে অনেক আলোচনা হয়। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাবলী, বিশেষ করে উপজাতিদের সম্পর্কে আলোচনা করি এবং তিনি আমাদের কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেন। কথাগুলির সারমর্ম ছিল ঃ পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার এবং জুম চাষের পরিবর্তে কৃষিকার্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে সে সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ। সংক্ষেপে তিনি বলেছিলেন তোমাদের রণধ্বনি হোক ঃ 'কাউ এণ্ড প্লাউ' ও শিক্ষা এবং বিশেষ করে পিক্টোরাল। তিনি আরও বলেছিলেন, বিনয়ী হবে, লোককে বোঝাবে। হেসে তিনি বলেছিলেন 'ইউ অনলি নো হাউ টু স্ট্রাইক বাট ইউ ডু নট নো হাউ টু আরগু'। এ বলিষ্ঠ রণনীতির উপর ভিত্তি করেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করি ও উদ্যম গ্রহণ করি।

১৯৪৭ সালে প্রয়াত কমঃ ক্যাপটেন ঊষা দেববর্মা আমাদের সাথে এসে মিলিত হ'ন। তার উপস্থিতিতে আমাদের শক্তি স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পায়। বলে রাখা দরকার কমঃ ঊষা দেববর্মা উচ্চতম সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে কমিশনড্ অফিসার হিসাবে ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়নে যোগ দেন। ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন যুদ্ধের পর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফলে ঊষা ক্যাপটেনও ঘরে ফিরে আসেন। এবং পার্টির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কলেজে শিক্ষা জীবনেও তিনি পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাছাড়া কানু সেন ও প্রবোধ চক্রবর্তী (বঙ্কিম চক্রবর্তী) এ সময় আগরতলায় চলে আসেন। কমঃ প্রবোধ চক্রবর্তী আন্দামানে ছিলেন এবং সেখানেই তিনি কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে

আকৃষ্ট হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমঃ প্রবোধ চক্রবর্তী পার্টির বেআইনী অবস্থায় এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং পার্টির অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ সতর্কতার সাথে সার্থক রূপায়ণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

সকলের উপস্থিতি আমাদের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাছাড়া সে সময়ে পার্টিতে যোগদান করেন কমঃ দ্বিজেন আচার্য্য, শান্তি দত্ত ও গৌরাঙ্গ দেববর্মা। কমঃ নিমাই দেববর্মা ও জ্যোতি ভট্টাচার্যও আমাদের সহযোগী ছিলেন। কিছুদিন পর কমঃ আতিকুল ইসলাম পার্টিতে আসাতে আমরা শহরের বুকে সাংগঠনিক কাঠামোকে একটু সবল করে তুলতে সক্ষম হই। ১৯৪৭ সালে পার্টি সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরই প্রকৃত প্রস্তাবে পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হই। শহর আগরতলায় আমরা পার্টির সাংগঠনিক কাজেব সাথে সাথে পাবলিক মিটিংও করতে সক্ষম হয়। এবং সে মিটিংগুলি একেবারে ছোট ছিল না। বিশেষ করে কমঃ অম্বিকা চক্রবর্তীর আগমন উপলক্ষ্য করে গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে বিশেষ করে এ রাজ্য ভারতভুক্তির দাবীতে আমরা এক বিরাট জনসমাবেশ করতে সক্ষম হই। এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্যের কয়েকটি মৌল সমস্যার উপর দষ্টি রেখে এবং এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রবর্তনের দাবী নিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রমের মৃত্যুর পর রাজ্যে একটা অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। একদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি সংগঠিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেন এমন কি রাজ পরিবারের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিও এই আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং প্রকাশ্য না হ'লেও গোপনে সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। এছাড়া ঠাকুর লোকদের মধ্যে একটি অংশ রাজকুমারদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্যাংক্রাক আন্দোলন শুরু করে।

আমাদের সুবিধা ছিল এই যে বীরবিক্রম তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ভারতভুক্তির পক্ষেই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। রাজ্যের আপামর জনসাধারণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতভুক্তির পক্ষেই ছিলেন। পার্টিগত অবস্থানেও কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক সকলেই ভারতভুক্তির জন্য সক্রিয় আন্দোলন করছেন। তবে, দুঃখের হলেও বলতে হয়, কোন সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে উঠেনি— ফলে ত্রিপুরায় ভারতভুক্তির পরেও গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে নি। এসময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শরৎ বোসের আগমনও ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু নিঃসংকোচে বলা যায় কম্যুনিষ্ট পার্টিই ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। রাজ্যের সর্বত্র যখন অশান্তির পরিবেশ এবং আগরতলা শহরে যখন নিরাপত্তার অভাব তখন আমাদের পক্ষে থেকে এরাজ্যে অবস্থিত দিল্লীর প্রতিনিধির কাছে এক ডেপুটেশন নিয়ে পার্টির পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন সাক্ষাৎ করি। রাজ্যে তখন চলছিল অত্যন্ত অস্থিতিশীল অবস্থা — জন-জীবন বিপন্ন যে কোন সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা। আইন শৃঙ্খলার অবনতি পণ্য-দ্রব্যের অভাব এইসবের প্রতিকার আমরা দাবী করলাম। উত্তরে জানলাম মহামান্য প্রতিনিধির কিছুই করার নেই। প্রশাসন অচল — তিনি আমাদেরই সাহায্য চেয়ে এমন এক অভিনয় করলেন যে আমরা হতভম্ব হয়ে ফিরে এলাম। সে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। বুঝলাম প্রশাসন আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এই সময় খোকা

দত্ত (কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা) আগরতলা এসে আমাদের উৎসাহিত করেন।

অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য পার্টি তখন অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে পরামর্শক্রমে গ্রামে-গঞ্জে শান্তি সেনা গঠন করে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আহ্বান জানায়। এ আহ্বানে সাড়া দেয় ত্রিপুরার মানুষ। গ্রামে-গঞ্জে গড়ে উঠে 'শান্তি সেনা'।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসার লাভ করার সাথে সাথে প্রশাসন ও প্রতিক্রিয়াশীল জোট সংহত হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আঘাত হানে। এবং জাতি ও উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য বাঙ্গালী সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেয়। পরবর্তীকালে যখন জেলে যাই তখন উপলব্ধি করলাম পুলিশ ও কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তি কিভাবে নিরীহ মুসলমান প্রজা সাধারণের উপর বর্বর আক্রমণ ও অত্যাচার সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে জেলে দেখা হয়। পরবর্তীকালে এদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়েব মধ্যে পার্টির সংগঠন গড়ে তুলতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। এই অবস্থায় রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি, ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তার ঘটাবার জন্য পার্টি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল। ১৯৪৭ সালে আরেকটি বিশেষ ঘটনা হ'ল সংস্কৃতিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ এবং এ কাজে আমাদের কিছুটা সঠিক পদক্ষেপ। আমরা ত্রিপুরার মূল সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করি এবং তার সৃষ্টিধর্মী প্রকাশে সাহায্য করি। গড়ে তুলতে চেষ্টা করি একটি সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিমণ্ডল। একাজে আমাদের সহযোগী ছিলেন কবি এবং সাংস্কৃতিক কর্মী মনিময় দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববর্মা এবং আরও অনেকে। এদের নিয়ে গঠিত একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ১৯৪৭ সনে শিলচরে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করে। ত্রিপুরার আঞ্চলিক সংস্কৃতি তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে বৃহত্তর ভারতের মূল স্রোতের সাথে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্থান করে নিতে পারে এটা তাঁরা প্রমাণ করলেন।

১৯৪৭ সনে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা একটু বর্ণনা করা প্রয়োজন। মহারাজার মৃত্যুর পর প্রশাসনের কাজকর্ম আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। আইন শৃঙ্খলাব অবস্থার অবনতি ঘটে। রাজ পরিবারের কিছু সংখ্যক কর্তা ব্যক্তি কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাথে যুক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে এক চক্রান্ত-জাল বিস্তাব করতে সক্ষম হন। আগরতলা শহরের বুকে পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগঠিত মিছিল ও আন্দোলন এক নতুন পরিস্থিতি গড়ে তোলে। গেদু মিঞাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন সংগঠনের চেষ্টা চলে। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ —— এবং বিশেষ করে ত্রিপুরীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত এক দল অবস্থাপন্ন হিন্দু-মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে এবং পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার কাজে মুসলমানদের উস্কানী দেয়। যাক্, শেষ পর্যন্ত ভারতভুক্তির প্রশ্ন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। শেষ পর্যন্ত সিলেটে গণভোটের সময়

মুসলিম সম্প্রদায়কে কোন সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যায় নি। পরবর্তী সময়ে চাক্‌লা রোশনাবাদ অঞ্চলের (চাকলা রোশনাবাদ অঞ্চল ছিল মহারাজার জমিদারীভুক্ত অঞ্চল — সিলেট থেকে ফেণী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল — কুমিল্লা ছিল জমিদারীর প্রধান অফিস ও চাকলা-রোশনাবাদ অঞ্চলের খাস সেরেস্তা) কিছু অংশ — বিশেষ করে বর্তমান মোহনপুর সংলগ্ন এলাকার জনবহুল পরগণা ত্রিপুরা রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। ত্রিপুরা সরকার থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা চলে। তৎকালীন সেন্সাস অফিসার যতীন্দ্র মোহন সেন সার্ভে স্টাফ কামিনী কর এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের তরফ থেকে মেমোরাণ্ডাম দেয়া হয়। যাক্ সে কথা। সেদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও কিছু সচেতনশীল ব্যক্তি প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কংগ্রেসের দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও তারা তাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ভারত বিভাজনে যে বিরাট সমস্যা — বিশেষ করে ভারতের অখণ্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক যে বিনষ্ট হবে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারত বিভক্তি এবং তার ফলে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি সমাপ্ত হ'বার পর রাজ্যের স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে খুবই বেগ পেতে হয়। ক্রমাগতভাবে এবং পর্যায়ক্রমে উদ্বাস্তু আগমনে রাজ্যের অর্থনীতি ভারসাম্য নষ্ট হ'বার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং জাতিগত সমস্যার অনেক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতঃই ব্যক্তি ও সম্প্রদায় উভয়ক্ষেত্রেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হ'তে শুরু হয়। রাজনীতিতেও তার প্রতিফলন ঘটে। এখানে সংক্ষেপে একথাই বলে চলে যে কো-রিলেশন অফ ফোরসেস-এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন শুরু হয়।

এই বিশ্লেষণের একটি মোটামুটি ধারণা নিয়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই। ১৯৪৭ সালে গ্রামে গঞ্জে এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করি। কারণ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত (স্ট্রাকচারাল) পরিবর্তন আনতে না পারলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাভূত করে গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ সম্ভব হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন ও তার প্রক্রিয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শুধু না হ'লে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে রূপায়িত করার পরিকল্পনা আদৌ ফলপ্রসূ হবে না। আমরা উপলব্ধি করতে পারছিলাম যে, সমাজতন্ত্রের নিগড় উৎপাটিত করতে হ'বে এবং মানুষের মনন জগতে যে কু-সংস্কার ও অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাব বদ্ধমূল হয়ে শিকড় গেড়ে রয়েছে সেখানে আঘাত হানতে হবে।

এই কথা মনে রেখেই আমরা প্রজামণ্ডল ও জন-শিক্ষা সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠ ও একান্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে অগ্রসর হই। বলতে দ্বিধা নেই যে এই দুটি সংগঠনের পেছনে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা ও আদর্শগত চিন্তাধারা প্রজামণ্ডল ও জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছিল।

রাজনৈতিক মতবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক নয় এমন বহু কর্মী ও জনগোষ্ঠীকে কর্মে প্রেরণা দিয়েছিল। প্রজামণ্ডলের সাংগঠনিক কাজকর্ম আমাদের সক্রিয় ভূমিকা তখন আমাদের তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন তথা প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ ও ভারতভুক্তির সম্পূর্ণ রূপদান আন্দোলনের পাদপ্রদীপে টেনে আনে। আমাদের ও আরও বহু গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ভাবধারায় উজ্জীবিত বহুকর্মীকে এ রাজ্যের রাজনীতিতে সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে। এ হ'ল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মোট কথা প্রজামণ্ডলের ও জনশিক্ষা আন্দোলন আমাদেরকেও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতির মূলস্রোতের সাথে মিশতে সাহায্য করে। দেখা যায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত শত চেষ্টা করেও আমাদের আন্দোলনকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয় নি।

প্রজামণ্ডলের কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর ওরফে অমরেন্দ্র দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রজামণ্ডলের পক্ষে প্রচারে বের হই। এই প্রচার কার্যে মূলতঃ রাখা হত 'প্রজার ভোটে সরকার চাই', ভারতভুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীসমূহ। আমরা আমলা কর্মচারীদের ও তালুকদারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। প্রভাত রায়ের সঙ্গে আমরা বামুটিয়া এলাকায় ঘুরেছি --- এছাড়া উদয়পুরের বাদশা মিঞা, সোনামুড়ায় নিরঞ্জন সেন, কৈলাশহরে কীর্তি সিং (উকিল), বিমল দেব, ধর্মনগরেও কৈলাশহরে বিভিন্ন অঞ্চলে মনিপুরী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রজা সাধারণের সাথে প্রজামণ্ডলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রচারকার্য চালিয়ে যাই। সদর এলাকায় আমতলী, সূতার মুড়া, লাল সিং মুড়াও জন্মেজয় নগর, দুর্গাচৌধুরী পাড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও আমরা পরিভ্রমণ করি ও প্রজামণ্ডলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রজার অভিযান সংগঠিত করি। সদর এলাকায় প্রজামণ্ডলের কাজে বিশেষ করে হেমন্ত দেববর্মার সাহায্য আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এ সমস্ত কাজে সুধন্ব দেববর্মাও অগ্রণীর ভূমিকায় সর্বদাই আমাদের পাশে ছিলেন। আমাদের পরিক্রমার মধ্যে যে সমস্ত স্থানে আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করেছি সেগুলো ছিল কমলপুর, কৈলাশহর, ফটিকরায়, কাঞ্চনপুর, ময়নারমা, ধর্মনগর ও খোয়াই। কমলপুরে আমাদের সহকর্মী ছিলেন ধর্মরায়, কৈলাশহরে কমঃ বৈদ্যনাথ মজুমদার ও প্রয়াত রাসবিহারী পাল। উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণ করার সময় কমঃ বীরচন্দ্র দেববর্মার সাথে আমি যৌথভাবে সমস্ত অঞ্চলে যাই। মানুষের মনে বিশেষ করে কৈলাশহর শহরাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান ও মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। কৈলাশহরে শিক্ষিত সমাজে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি মণিপুরী সর্বক্ষেত্রে আমরা এক অদ্ভুত আলোড়নের স্পন্দন অনুভব করি। মনে পড়ে কাঞ্চনপুর মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গোঁড়ামি ও জাতপাতের প্রশ্ন লক্ষ্য করি তা আমাদের এক অদ্ভুত আলোড়নের স্পন্দন অনুভব করি। মনে পড়ে কাঞ্চনপুর মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গোঁড়ামি ও জাতপাতের প্রশ্ন লক্ষ্য করি তা আমাদের বিশেষভাবে এড়িয়ে চলতে হত। অনেক সময় বিপদের ঝুঁকিও নিতে হত। কাঞ্চনপুর গ্রামে আমাদের খোলা বারান্দায় ঘুমুতে হয়েছে। কারণ এই নয় যে স্থানাভাব, কারণ হল আমাদের ছোঁয়া তাদের ঘরকে যদি অপবিত্র করে এই আশঙ্কা। সে সময় কাঞ্চনপুর গ্রাম ছিল হিংস্র বন্যজন্তুর বিচরণের স্থান।বশেষ করে বাঘের

উপদ্রব ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। এ অবস্থায় আমাদের রাত্রে ঘুমুতে হত উন্মুক্ত বারান্দায়। কিন্তু সে সবই উপেক্ষা করে আমাদের চলতে হয়েছে। মনে পড়ে তা সত্ত্বেও কাঞ্চনপুর সে সময় ছিল একটি উন্নতমানের গ্রাম। কৈলাশহর থেকে সব অঞ্চলে আমাদের পদব্রজে যেতে হত। রাস্তাঘাট বলতে কিছু ছিল না। মনু নদীর পার ঘেঁষে দু'পায়ে হাঁটা পথে যখন ময়নারমা ধূমাছড়া অতিক্রম করে যাই তখন খুবই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্য ময়নারমা পৌঁছে প্রয়াত মাধব মাস্টার (চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত) মহাশয়ের বাড়ীতে যখন পৌঁছি তখন এক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে যাত্রাপথের সব কষ্ট ভুলে যাই। মাধব মাস্টারের বাড়ীতে আমরা কয়েকদিন অতিবাহিত করি। তাঁর বাড়ীতে ছিল ছোটখাট একটি লাইব্রেরী। সেখানে এই প্রথম পড়ার সুযোগ ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়ার চিঠি। বইটি পেয়ে আমরা খুবই খুশী হই। এবং এই সংস্কৃতমনা লোকটির সাহচর্য পেয়ে আনন্দিত হই। তাঁর জ্ঞানের পরিধির পরিচয় আমাদের মনে দাগ কাটে। তিনি শুধু লেখাপড়ার জন্যই আমাদের প্রশংসিত হন নি, তাঁর অন্যান্য কাজ দেখেও আমরা আকৃষ্ট হই। তাঁর নিজের হাতে গড়া বিরাট ফলের বাগান তাছাড়া আধুনিক কায়দায় কৃষিকাজের তৎপরতা দেখেও আমাদের ভাল লাগে। সেখানেই প্রথম দেখি সোয়াবিনের চাষ। আমাদের আরও নজরে পড়ে তাঁরই নিজস্ব তত্ত্বাবধানে গড়া বুদ্ধ মন্দিরটি। সব মিলিয়ে সেই ১৯৪৭ সনে এ সমস্ত দেখার আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল। মনে হয় এসব প্রগতিশীল ব্যক্তিরা যদি রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে এসে উন্নয়নমূলক কাজ করতে উদ্যোগী হতে পারতেন — তবে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার সাধিত হয়ে কৃষকদের সত্যই উন্নতি পরিলক্ষিত হত। এবং কৃষকরা বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়ে শুধু নিজেদের নয় সমস্ত ত্রিপুরাকে খাদ্যে ও কৃষিজাত অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যে স্ব-নির্ভর হতে সাহায্য করতে পারত।

চাকমা সম্প্রদায়ের এক জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্যে এসে বসতি স্থাপন করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অঞ্চল থেকে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে তাদের এ রাজ্যে বাধ্য হয়ে আগমন ঘটে। বর্তমানে এটি একটি এথনিক প্রশ্ন। এবং এ প্রশ্নের সমাধান আশু প্রয়োজন। চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদীক্ষার মান ত্রিপুরা রাজ্যে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে শুধু পৃথকই নয়, তা বলতে গেলে একটু উঁচু মানের। ধর্মের দিক থেকে তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং সংস্কৃতি, ভাষাও ভিন্ন। তাদের এই নিজস্ব প্রকৃতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে কিভাবে ত্রিপুরার মূল সংস্কৃতির সাথে মিশিয়ে ত্রিপুরার বুকে একটি বলিষ্ঠ ও সঙ্গতিপূর্ণ কৃষ্টির বিকাশ ঘটতে পারে এ প্রশ্ন তখনই আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু বলতে বাধা নেই আমাদের চিন্তাধারা উন্মুক্ত হবার তখনও পরিবেশ গড়ে উঠে নি। ... .

কৈলাশহর ও ফটিকরায় বেশ কিছুদিন আমাদের অবস্থান একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফটিকরায়ের আশেপাশ অঞ্চলে আমরা বেশ খানিকটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হই। প্রকৃত জনসংযোগ বলতে যা বুঝায় তা ঘটেছিল ফটিকরায় ও কৈলাশহরে। কয়েকবারই আমরা কৈলাশহর ও ফটিকরায় যাই। থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ফটিক থানার দারোগা মন্টু মুখার্জি ও প্রভাত রায়ের ভগ্নিপতির বাসায়। সেখানে অবস্থানকালে কৈলাশহর তথা ফটিকরায় অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

পাহাড়াঞ্চলে উপজাতিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমরা আগরতলায় ডেপুটেশন দিই। রিয়াংরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশী। ব্রাউন সাহেব ছিলেন এ রাজ্যের মন্ত্রী। আমরা তাদের নামে বিনা মাশুলে গাছ, বাঁশ-ছন কাটবার পারমিট দেবার ব্যবস্থা করাতে সক্ষম হই এ কথা পূর্বেই বলেছি। ফটিকরায় সে সময় ছিল এ রাজ্যের একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র। বাঁশ-ছন, গাছ (টিম্বার) সমৃদ্ধ মনু নদী ও দেওগাঙ্গের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ফটিকরায় একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র ছিল সব সময় প্রাণচঞ্চল। আমরা দেখলাম বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ববাংলা থেকে বহু ব্যবসায়ী এই অঞ্চলের সমস্ত ব্যবসা নিজেদের হস্তগত করে রেখেছিল এবং পাহাড়ীয়াদের ভীষণ ও মারাত্মকভাবে শোষণ করছিল। এ অবস্থায় পারমিট ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পাহাড়ীয়াদের নামে হওয়ায় এই পারমিট বিক্রি করে পাহাড়ীয়ারা তাদের কষ্টের ভার কিছুটা লাঘব করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া গভর্ণমেন্টের তরফথেকে রিলিফ বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সত্যিকার গণসংযোগ থাকলে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারলে অভীষ্ট সিদ্ধি লক্ষ্যে অনেকটা সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র শক্তি ও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে যদি তা সঠিক পদ্ধতিতে এবং আলোচনার পদ্ধতিগত সঙ্গতি রক্ষা করে অগ্রসর হয়। সেদিনে আমাদের কার্যপন্থার দুটি হাতিয়ার আমরা বেছে নিয়েছিলাম — একটি জনসংযোগ মারফৎ জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট ও দুরবস্থার কথা আমাদের কাগজ 'ত্রিপুরারাজ্যের কথা'য় প্রকাশ ও প্রচার এবং দ্বিতীয় হলো সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও অভিযোগ পেশ ও তার প্রতিকারের জন্য আবেদন। এ কাজে কিছুটা সফল আমরা হয়েছিলাম। তার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। বক্তব্যের অন্যত্র আমরা এ কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করব। এখন আবার ফটিকরায়ের অবস্থানকালে ঘটনাবলীর আরও দু একটি রেখা চিত্র দিতে চেষ্টা করছি।

ফটিকরায় অবস্থান কালে আমরা একদিন দেও নদীর পাড় ধরে পাঁপিয়া ছড়ায় একটি লুসাই অধ্যুষিত গ্রামে যাই। পথ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, বন্যশূকরের আনাগোনা ছিল অবাধ। কমঃ বীরচন্দ্র দেববর্মা এ সময় আমার সঙ্গী ছিলেন। আমাদের সব কাজে তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহ আমাদের সাহস জুগিয়েছে। তাঁর চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুগামী। তিনি এই সময় কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে আমাদের বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। পাঁপিয়াছড়ার অধিবাসী সবাই ছিল ক্রিশ্চান। গ্রামে ছিল একটি সুন্দর গীর্জা। সুন্দর পরিবেশ। এই গ্রামের একটি লুসাই ছাত্রের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে আগরতলায়। সে ছিল আগরতলা অরুন্ধতিনগরে অবস্থিত স্কুলের ছাত্র। তারই সূত্র ধরে আমাদের আসা। একটি কথা না বললে সে দিনের গ্রাম্য পরিবেশের ছবি অস্পষ্ট থেকে যাবে। আমরা যখন গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা পড়ে আসছে। চারদিক নিস্তব্ধ। মনে হ'ল গ্রামে কোন লোকজন নেই। শুধু গীর্জা ঘর থেকে মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। আমরা কি করব ভাবছি --- এমন সময় হঠাৎ সাক্ষাৎ মিলল সেই ছেলেটির জানতে পারলুম গ্রামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই গীর্জায় সমবেত হয়েছে প্রার্থনা সভায়। ছেলেটি আমাদের বসিয়ে খবর দিল আমাদের আগমন বার্তার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রার্থনা শেষে গ্রামবাসী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হ'ল। সে অপূর্ব

দৃশ্য — আজ বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না। ফলমূল ও চায়ের ট্রে-তে চা পরিবেশন সহকারে আমাদের অভ্যর্থনা জানান হ'ল বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে। আমরা বিশেষ অতিথি হিসাবে শুধু সমাদৃতই হলাম না, আমাদের উপলক্ষ্য করে ভাষণ রাখা হ'ল। যার মধ্যে ফুটে উঠেছিল তাদের আন্তরিকতা ও মানবিক মমত্ববোধ। আর ঐ ভাষণে ফুটে উঠল তাদের দুঃখ বেদনার একটি করুণ ছবি। ক্রিশ্চান মিশনারীরা তাদের ধর্মাচার শিখিয়েছে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখিয়েছে। কিছু কিছু সেবামূলক কাজের মারফৎ তাদের চিন্তাধারার বিকাশ সাধনেও সচেষ্টভাবে কাজ করেছে এবং সর্বোপরি কিছুটা শিক্ষার বিস্তারে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু পারেনি বৈষম্য দূর করতে এবং নিদারুণ দারিদ্রতার অবসান ঘটাতে। জাতিগত ভেদাভেদ — সাহেব ও নেটিভও তাদের মনে দাগ কেটেছিল। সে কথাই ওদের স্বাগত ভাষণের মধ্যে ফুটে উঠল। উত্তরে আমরাও সমবেদনা জানালাম এবং শ্রেণীগত বিভেদের উপর আলোকপাত করলাম। মূল প্রশাসনের কাঠামোকে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত করে মানবিক মূল্যাবোধ বিস্তার ঘটাবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলাম। অবশ্যই এই সাথে প্রজামণ্ডলের আদর্শ ও বাণী তাদের কাছে উপস্থাপিত করতে ভুল করলাম না। ঘুরে এসে আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হল জনসংযোগ ও জনসাধারণের সাথে সহমর্মীতা বোধ আমাদের কাজের মধ্যে সংযোজিত করে ধারাবাহিকভাবে গণআন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হবে।

কৈলাশহর ও ধর্মনগর প্রচারকার্যে একস্থান হ'তে অন্যত্র যাতায়াতের সময় তৎকালীন ছাত্রনেতা মহেন্দ্র সিং এই দুর্গম অঞ্চলে আমাদের সাথে থেকে পথ প্রদর্শক হিসাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর বাড়ী ছিল আমাদের আশ্রয়স্থল। তাছাড়া কমঃ বৈদ্যনাথ মজুমদারের বাড়ী ছিল আমাদের জন্য সব সময়ে উন্মুক্ত। মহেন্দ্র সিং পরবর্তীকালে নিজ দক্ষতায় ত্রিপুরা সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন অমায়িক ও মিষ্টভাষী। এখানে প্রয়োজন যে ত্রিপুরায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না। উত্তর অঞ্চলে, এমন কি দক্ষিণ অঞ্চলেও হয় হাঁটা পথে অথবা রেলযোগে (বর্তমান বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে) আমাদের যাতায়াত করতে হ'ত। রেলযোগে যাতায়াত খুব সুবিধাজনক ছিল না। সেখানেও অনেকটা পথ হেঁটে তবে রেল ভ্রমণ ব্যবস্থা করতে হ'ত। কাজেই বেশী সময়ই আমরা হাঁটা পথে যাতায়াত করতাম। কৈলাশহর থেকে ধর্মনগরে যেতে হলে হাঁটা পথে — দেবতামুড়া পার হয়ে পাহাড়ী ছড়ার (স্ট্রীমলেট) উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধর্মনগর পৌছতে হ'ত। প্রায় ২০ মাইল হাঁটার পর আমাদের বিশ্রামলাভের সুযোগ ঘটত একটি চা বাগানে (ধর্মনগরের সন্নিকটবর্তী মাইল তিনেক দূরে)। বাগানের ম্যানেজার সে সময় আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারই করতেন। পথে অবশ্য দু' একটি বস্তি আমরা লক্ষ্য করেছি। তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের বর্ণনা দেওয়া আমাদের সম্ভবপর নয়। মনে হ'ত তারা যেন এক আদিম যুগের অধিবাসী। দেবতামুড়ার উচ্চতম শিকড়ে ছিল একটি হালাম পরিবার। গৃহপালিত শূকর ও অন্য পশুদের সাথে দেখেছি তারা একই পাত্রে আহার করছে। অন্য বস্তির অধিবাসীরাও ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। দুনিয়ার কোন খবরই তাদের কাছে পৌছতো না। ছড়ার উপর দিয়ে যেতে যেতে জলের কল কল শব্দ, চারিদিকের বনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে পথ চলার ক্লান্তি বোধ

অনেকটা লাঘব হয়ে আসত, শেষ পর্যন্ত বেলা শেষ নাগাদ ধর্মনগর গিয়ে পৌঁছলাম এবং আশ্রয় নিলাম ধর্মনগরের কাছে এক মনিপুরী গ্রামে কমঃ রাজকুমার সিং-এর বাড়ীতে। রাজকুমার সিং-এর বাড়ী ছিল আমাদের আশ্রয়স্থল। তিনি আগরতলায় থেকে পড়াশুনা করেছেন এবং বি. এ. পাশ করে বাড়ীতেই থাকতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন উমাকান্ত একাডেমীর সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষক রেবতী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ছাত্র। তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ বিশেষ করে মনিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে আমাদের ধর্মনগরে কাজ করতে বিশেষ সুবিধা হয়। ধর্মনগরে প্রথমবার অবস্থানের সময়ই আমাদের পরিচয় ঘটে করুণা নাথের সাথে এবং কিছু শিক্ষিত যুবকের সাথে।

কৈলাশহর ও ধর্মনগরে শিক্ষিত যুবকদের সাথে আলোচনায় আমরা তাদের একটি দাবীর প্রশ্নে ঐকামত পোষণ করলাম এবং প্রজামণ্ডলের কর্মসূচীর মধ্যে সে দাবী অন্তর্ভুক্ত করলাম। তাদের সাথে আলাপে উপলব্ধি করলাম যে, এ রাজ্যে প্রশাসনের উচ্চপদে বিশেষ করে টি. সি. এস. পদে এ রাজ্যের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের কোন স্থান নেই। প্রায় সমস্ত অফিসারই বহিরাগত এবং পলিটিক্যাল এজেন্ট-এর অনুমোদিত। এ ব্যবস্থার প্রতিকার দাবী করে আমরা দাবী করলাম টি. সি. এস. পদে এরাজ্যে শিক্ষিত যুবকদের নিতে হবে এবং তাদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে হবে। আমাদের দাবী পরবর্তী সময় আংশিক হ'লেও স্বীকৃতি পায় এবং শিক্ষিত যুবক টি. সি. এস. পরীক্ষায় বসবার সুযোগ পান এবং পরীক্ষায় যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত হ'ন। আমাদের আন্দোলনের চাপে সরকার একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভাও গঠন করতে বাধ্য হ'ন। যদিও এই মন্ত্রিসভা ছিল মনোনীত। মনোনীত মন্ত্রিসভার গঠনকাল হ'ল ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে। এই মন্ত্রিসভায় তিনজন মন্ত্রি ছিলেন। নন্দলাল দেববর্মা, কামিনী সিং ও তজিমুদ্দীন সাহেব এই তিনজনকে নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা গঠনে মূল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বর্গ থেকে মনোনয়নের একটি পদ্ধতি লক্ষ্যণীয়। বলা যায় ত্রিপুরী, মণিপুরী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদেরই এই রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল। সেদিক বিবেচনা করেই গণ-অসন্তোষকে ধামাচাপার জন্যই মনে হয় এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রথার প্রবর্তন। এই মন্ত্রি পরিষদ আসলে কাজ করে যায় যখন মহারাণী ছিলেন রিজেন্ট এবং এই ব্যবস্থা চলে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত। পরিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তির পর রাজ্যের প্রশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নিযুক্ত হন একজন দেওয়ান— যারা সাধারণত হ'তেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস। প্রথম দেওয়ান হ'ন বি. কে. আচার্যী। তারপর আসেন এ. বি. চ্যাটার্জী এবং এরপর আসে নানজাপ্পার যুগ। যার নাম ত্রিপুরাবাসী বিশেষ ভাবে মনে রেখেছে কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী হিসাবে ও তাদের উপর নিপীড়নের জন্য। অবশ্য প্রশাসক হিসাবে তার সুনামও যথেষ্ট ছিল এবং প্রশাসনের কাজকর্মে তিনি সচলতা আনতে সক্ষম হ'ন। তারই আমলে মেধাবী ছাত্রদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে অন্য প্রদেশে উচ্চ-শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বৃত্তি দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়।

আমাদের কথা একটু অন্যদিকে মোড় নিলেও এই বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক বলেই আলোচনায় সূত্রপাত করা হল। বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ও যাতায়াতের মাধ্যমে যেমন জনসাধারণের সংস্পর্শে

এসে তাদের সমস্যাসমূহ যেমন, আমলা কর্মচারীদের দ্বারা নির্যাতন ; নানাবিধ কর আদায় (পথ কর, ঘর চুক্তি) শিক্ষার অপ্রতুলতা, বেকার সমস্যা, উপজাতিদের উপর মহাজনের শোষণ ও উপজাতিদের জমি বে-আইনীভাবে দখল ও হস্তান্তর, উপজাতিদের উপর বন-বিভাগের নানারূপ নির্যাতন, জমি সামন্ততান্ত্রিক প্রথার প্রচলন ; সমস্তরকম গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, যাতায়াতের অসুবিধার, রাস্তা ঘাটের একান্ত অভাব ; ব্যবসা-বাণিজ্য কতিপয় ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ও তুখলকী ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতা—সব মিলিয়ে ছিল প্রজাসাধারণের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষের একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এবং আমরা আন্দোলনের ও প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে এই মূল দাবীগুলি তুলে ধরি। সাথে সাথে একথাও বুঝতে পারি যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে প্রশাসনিক কাঠামো রূপান্তর ঘটাতে না পারলে এসব মূল দাবী পূরণ হ'বে না। এ জন্য আমাদের সংগ্রামের প্রধান রণধ্বনি হয় পরিপূর্ণভাবে ভারত অন্তর্ভুক্তি ও শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রবর্তন। এই সংগ্রামে আমাদের সমস্ত কর্মীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাই এবং প্রজামন্ডলের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করি। একই সাথে পার্টি সংগঠনের কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। ১৯৪৭ সনে আমরা কুমিল্লাতে ইলেকশনের কাজেও ব্যাপৃত থাকি। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পার্টি সংগঠনের একটা ছাপ ফেলতে চেষ্টা চলে। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই। উল্লেখ করা যেতে পারে উদয়পুর ও সোনামুড়া প্রভৃতি স্থানেও সদরের জিরানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে একই কার্যক্রম নিয়ে আমরা ১৯৪৮ সনে অগ্রসর হতে থাকি। ১৯৪৮ সনের বড় ঘটনা হ'ল কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির ২য় কংগ্রেস ও আমাদের যোগদান। এ কথা সঠিকভাবে বলা শক্ত যে এ রাজ্য থেকে কে কে ডেলিগেট হয়ে গিয়েছিলেন। তবে কমঃ বীরেন দত্তের কাছে জানতে পেরেছি বীরেন দত্ত, অঘোর দেববর্মা ও দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত কলকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে আমার মনে হয় না। আমি ও বীরেন দত্ত কলকাতায় গিয়েছিলাম এবং অনুষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে উপস্থিতও ছিলাম। অঘোরবাবু উপস্থিত থাকলে বা ডেলিগেট হয়ে গেলে সে কথা আমার জানা থাকত। কিন্তু প্রথমতঃ আমি জানি না, দ্বিতীয়তঃ আমি কোথাও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করিনি। সেদিনে পার্টি পরিকল্পনা পদ্ধতি ছিল আজকের চিন্তাধারার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং খানিকটা অ-গণতান্ত্রিক। এবং ফেকশানালিজম ছিল খুবই বেশী। কমঃ বীরেন দত্তের কাজের সমালোচনা না করেও বলা যায়, পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনের মধ্যে। প্রথমতঃ এখানকার পার্টি ইউনিট ছিল কুমিল্লা পার্টির অনেকটা লেজুড় এবং তারপর বীরেন দত্তের পরিচালনা ও নির্দেশ আমাদের কাছে অনেক সময় বিভ্রান্তকর বলে মনে হ'ত। এ প্রসঙ্গে পরে আরও আলোচনা করা যাবে।

কলকাতা কংগ্রেস একদিকে ঐতিহাসিক। এখানে নেতৃত্ব বদল হয় এবং পি. সি. যোশীর পর পার্টির নেতৃত্বে অর্থাৎ সেক্রেটারী হ'ন বি. টি. রণদিভে। পি. সি. যোশীর অপসারণ ছিল— আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

পি. সি. যোশীর ভুল কোথায় ছিল তা আমার কাছে আজও স্পষ্ট নয়। অধিকন্তু যোশীর

অপসারণের মূলে রণদিভে গোষ্ঠীর যে ষড়যন্ত্র ছিল আজ তা প্রকাশ হয়ে গেছে। যোশীর অফিস সেক্রেটারী যিনি ছিলেন তিনিই রণদিভের সময়ও সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর কিছু লেখার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই ষড়যন্ত্রের কথা। যোশীর মত এতবড় সংগঠক ও গণ-সংযোগ রক্ষা করে চলার মত লোক আজও কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে এ দেশে গড়ে উঠেছে বলে আমার মনে হয় না। তিনি ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। পরবর্তী সময় ১৯৭৮ সনে ভাতিন্ডা পার্টি কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে কংগ্রেসে যাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। পি. সি. যোশী ঐ কংগ্রেসের রুগ্ন অবস্থায় (প্রায় সম্পূর্ণ অথর্বভাবে) গিয়েছিলেন। সমস্ত ডেলিগেট বা কংগ্রেস হ'লে তাকে স্ট্রেচার -এ করে নিয়ে আসার সাথে যে বিরাট অভিনন্দন তাকে জানান হয় তা বলতে গেলে অভূতপূর্ব। বলতে হয় এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় কলকাতা কংগ্রেসের পূর্বে যোশীর ভাষণ শোনার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সনে যে বিরাট দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল— তার বিবরণ তিনি দিয়েছিলেন— সে বিশ্লেষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সরকারকে অর্থাৎ নেহেরু সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানাবার কথা তিনি বলেছিলেন। দাঙ্গার এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ এবং তার ভয়াবহতা যে কত গভীরে সম্প্রসারিত হতে পারে এবং জাতীয় সংহতি কিভাবে বিপন্ন হতে পারে তার চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতির মধ্যে এমনকি সরকারী কর্মচারী পুলিশ এমনকি মিলিটারীর মধ্যেও তার প্রভাব ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক। এই অবস্থায় পন্ডিত নেহেরুর সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা ও সাহসিকতার সাথে দাঙ্গার মোকাবিলাকে আজ আমাদের সন্মান দেখাতে হ'বে। এবং এই সরকারকে সমস্ত রকম সাহায্য করতে হবে— গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে সঞ্জীবিত করে তুলতে এবং জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মহান ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে হবে। আজ মনে হয় একথা কত সত্যি।

কলকাতা কংগ্রেসের পব অন্য একটি সুযোগ ঘটেছিল রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি সভায় উপস্থিত থাকবার। যতটুকু মনে পড়ে এই প্রথম বুঝলাম রবীন্দ্রনাথ কতবড় প্রতিভাধর ব্যক্তি কতবড় কবি, স্রষ্টা ও দেশ-সেবক ছিলেন। আমাদের পূর্বের ধারণা সংস্কারমুক্ত ছিল না। তা ছিল অন্ধ গোড়ামি দ্বারা আচ্ছন্ন।

কলকাতা পার্টি কংগ্রেস ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে আমার দেখা হয়েছিল মেদিনীপুরের দুই কমরেড ভূপাল পাণ্ডা ও সরোজ রায়ের সঙ্গে। এরা দু'জনেই আমার জেল জীবনের সাথী ছিলেন। তাছাড়া আরও অনেক জেল জীবনের বন্ধুদের সাথে দেখা হয়েছিল। যারা জেলে কম্যুনিষ্ট মতে দীক্ষিত হয়ে বাইরে এসে পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। মনে পড়ে দেখা হয়েছিল সন্তোষ ভট্টাচার্যের সাথে। পরবর্তী জীবনে যিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যানসেলার হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে ভারতবর্ষের শিক্ষা জগতে এক প্রবাদপুরুষ হিসাবে নিজেকে পরিচিত করাতে পেরেছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসের সময় পার্টি পরিচালিত পি. আর. সি. (পিপলস্ রিলিফ কমিটি) ও তাদের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতাল দেখবার সুযোগ

ঘটে। সেখানে দেখবার সুযোগ ঘটে বর্মিজ কম্যুনিষ্ট পার্টি সেক্রেটারী সি-কে। তিনি তখন অসুস্থ অবস্থায় পি. আর. সি. পরিচালিত হাসপাতালে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন (কনভ্যালসেনস্ পিরিয়ড) সব মিলিয়ে এবং পার্টি কম্যুনিষ্টগুলো এবং বিশেষ কমরেড্‌দের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সু-সম্পর্ক এবং একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ আমার মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল। আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম পরিমল সেন চৌধুরীর কালিঘাটে অবস্থিত বাসায়। এই বাসাও ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি মিলন কেন্দ্র। পার্টির গোপন অবস্থায় আমরা তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী — এই বাড়ীর মারফৎ পার্টির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এই বাড়ীর বিশেষ ভূমিকা কলকাতা কংগ্রেসের সময়ও লক্ষ্য করছি। কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় এই বাড়ীতে থেকে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেত্রী গীতা মুখার্জী ও তাঁর সহকর্মী অলকা মজুমদার। এই বাড়ীটি বহু সাংস্কৃতিক জগতের রথী মহারথীর মিলন কেন্দ্র ছিল সেদিন। আসতেন হেমন্ত মুখার্জি, তৃপ্তি মিত্র। সব মিলিয়ে এমন সুন্দর পরিবেশ পূর্বে কখনও দেখিনি— এসবই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। পার্টি জীবনের এই সুন্দর দিকটি মনে হয়েছিল কম্যুনিষ্ট মোরাল ও তার মানবিক দিক। মনে হয়েছিল কত প্রগতিশীল ও সৃষ্টিধর্মী।

এসব সত্ত্বেও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে পার্টি তার ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং এও প্রমাণিত হয়েছে বাস্তব অবস্থার মূল্যায়নে পার্টি যে কত বড় ভুল করেছিল আজ তা স্বীকৃত এবং নেতৃত্ব বদলের প্রশ্নে যে অ-গণতান্ত্রিক পথ নেওয়া হয়েছিল তাও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সব মিলিয়ে পার্টি সেদিন বাম-বিচ্যুতির শিকার হয়েছিল এবং মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক। কলকাতায় অবস্থানকালে সাংবাদিক ও সমাজসেবী অমলেশ রায় চৌধুরীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ সেদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অমলেশ ছিলেন একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি। আমাদের প্রতি ছিল তার আন্তরিক ভালবাসা। একদিন তিনি আমাদেরকে নিয়ে যান তার আস্তানায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন প্রজামণ্ডলের কার্যক্রমের নানা দিক ও তার অগ্রগতি। প্রশংসা করেন 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা'য় আমাদের রিপোর্টগুলির এবং লেখাগুলির মান যে একটু নতুন ধরণের এবং বাস্তবধর্মী একথা স্বীকার করেন। এবং ব্যক্ত করলেন যে ত্রিপুরার সমস্যাসমূহ তিনি কলকাতায় কাগজগুলিতে প্রচার করতে সচেষ্ট থাকবেন। সে সময় তিনি ছিলেন সত্যযুগের সাথে যুক্ত। পরবর্তীকালে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা, তার মূল্যায়ন এবং আমাদের কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কুমিল্লা জেলার অধিবাসীদের সংগঠন, ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার ও ত্রিপুরায় যে নির্যাতন চলছে এবং যে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেদিকে তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটা ছিল আমাদের আন্দোলনের একটা নৈতিক জয়। আমরা যে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করছি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং জনমত গড়ে তোলায় আমাদের এক প্রচেষ্টা।

কলকাতা সম্মেলন থেকে শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে আমরা আবার কাজে নেমে পড়লাম। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি সত্যই 'এ আজাদি ঝুঠা হ্যায়' এ শ্লোগান তুলে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবার মত বাস্তব অবস্থা গড়ে উঠে ছিল? অথবা এখানে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে গণ-চেতনা দানা বেঁধে উঠেছে তা কি সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত? আমরা বিশ্লেষণ করে

দেখলাম যে আমরা আদৌ এজন্য প্রস্তুত নই। কাজেই প্রকাশ্যে পার্টি গৃহীত নীতির বিরোধিতা না করেও আমরা অগ্রসর হ'লাম গণতান্ত্রিক পথে প্রচার অভিযানে। সামন্ততন্ত্রের আমূল সংস্কার সাধন করে ভূমি সংস্কার, প্রজার ভোটে সরকার ও রাস্তাঘাটের উন্নতি (ইনফ্রাসটেকচার) ও শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করে যাব বলে সিদ্ধান্ত করলাম। এখানে বলা প্রয়োজন যে আমাদের দৃষ্টি পথে সেদিন জাতি সমস্যার প্রশ্নটিও আমাদের মনে প্রশ্ন তুলেছিল। যদিও আমরা এ ব্যাপারে সঠিক কোন ধারণা নিয়ে কার্যকরী পথ বেছে নিতে পারিনি। সে সময় পার্বত্য ত্রিপুরা ছিল মূলত কয়েকটি পাহাড়ী জনগোষ্ঠির অধ্যুষিত অঞ্চল। সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত অর্থে আমরা এই জাতি-গোষ্ঠির ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক এই সমস্ত দাবীর সার্বিক বিকাশকেই বুঝেছিলাম। আর এই দাবী সনদই ছিল জাতি সমস্যার সমাধানের মূল কার্যক্রম।

কলকাতা অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত মূল বিশ্লেষণের ভিত্তিই ছিল ভুল ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচ্যুতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে- যাকে বলা হ'ল ট্রানসফার অফ পাওয়ার ইন কনস্পিরেসী উইথ দি ইণ্ডিয়ান বুর্জোয়াজ। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই সেদিন এই মারাত্মক সংগ্রামের বিশ্লেষণের বিপরীতধর্মী ও ভুল ব্যাখ্যাজনিত। যা স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে এবং তার শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণে ত্রুটি ঘটায়। বাস্তব অবস্থার মূল্যায়নে পার্টি যে ভুল করেছিল সে কথা আজ স্বীকৃত এবং নেতৃত্ব বদলের ক্ষেত্রে যে পথ ও পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল তা যে কত বেশী অন্যায় ও ভুল ছিল আজ তা ইতিহাসের কাছে প্রমাণিত। মোট কথা পার্টি এক বাম-বিচ্যুতির শিকার হয়। ফলে পার্টির গণ-সংগঠনগুলো এবং মূল পার্টি গণ-অভ্যুত্থানের পথে অগ্রসরের পরিবর্তে সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই অবস্থার মধ্যে কলকাতা থেকে ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারে বিচার বিশ্লেষণে অক্ষম হয়েও ত্রিপুরার অবস্থা পর্যালোচনা করে আমরা বুঝলাম পার্টির সিদ্ধান্ত তৎকালীন সামন্ত ত্রিপুরায় কার্যকরী করা মোটেই সম্ভবপর হবে না। সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ হ'তে জনগণের মুক্তি আন্দোলন কেন্দ্রীভূত করার কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ভারতবর্ষের সাথে হ'লেও তার কাঠামোগত পরিবর্তন ও উপজাতিদের উপর শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য আন্দোলন গড়ে তোলাই হ'বে প্রাথমিক কাজ। আমরা জানতাম প্রশাসন থেকে আক্রমণ আসবে এবং গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সমস্ত বাধা মোকাবিলা করেই অগ্রসর হ'তে হ'বে।

উত্তরাঞ্চলে কৈলাশহর ধর্মনগর ও খোয়াই-এ আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে প্রথমে ব্রতী হ'লাম। এবারও আন্দোলন গঠন করার কাজে কমঃ বীরচন্দ্র দেববর্মা আমার সাথী হ'লেন। আমরা প্রজামণ্ডলের নামেই এবং প্রজামণ্ডলের কর্মী হিসাবেই কাজে অগ্রসর হ'লাম। একথা আমাদের ধারণায় ছিল প্রজামণ্ডলই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামের ক্ষেত্র এবং এর মধ্য দিয়েই জাতীয় চেতনার মূল ধারার বিকাশ ঘটেছে। অবশ্য অন্য একটি সংগঠনও একই সময়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত থেকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী

ছিল। কিন্তু আমাদের ভুল ছিল যে গণ-পরিষদের সাথে সার্বিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আমরা চেষ্টা করিনি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সঙ্কীর্ণ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে— বৃহৎ ঐক্য গড়ে তোলা যে একটি পবিত্র দায়িত্ব সে বোধই ছিল না। নিজেদের ক্ষুদ্র মন ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। আমাদের শিক্ষা হ'ল যে প্রগতিমূলক যে কোন কাজে এবং বিশেষ করে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন— আদর্শগত মৌলিক পার্থক্য থাকলেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সংযত করতে এই ঐক্য অত্যাবশ্যকীয়। গণ-পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন শচীন্দ্রলাল সিং এবং তাঁর সহকর্মী হিসাবে তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ও সুখময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। তবুও দ্বিধাহীন বলতে পারি আমরা বিভিন্ন স্থানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চেষ্টা করেছি। বারান্তরে সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব।

আমরা কৈলাশহর, ফটিকরায়, ধর্মনগর সমস্ত স্থানে জনসংযোগের জন্য অগ্রসর হই। কখনও রেল ও তারপর পায়ে হেঁটে সমস্ত অঞ্চলে প্রচার অভিযান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি। অন্যদিকে প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর (অমরেন্দ্র দেববর্মা) ও বীরেন দত্ত বিশেষ করে সদর অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে কাজ শুরু করেন। আমাদের কাজের মাধ্যমে কৈলাশহর ও ধর্মনগরে বিশেষ সাড়া জাগাতে সমর্থ হই। কৈলাশহরে সেদিনের বিশিষ্ট উকিল কীর্তি সিং (অমর সিং-এর পিতা) এবং আরও অনেক মণিপুরী এবং কৈলাশহরের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় আমাদের কাজে বিশেষ সাড়া দেন এবং গণতান্ত্রিক দাবীগুলো সমর্থিত হয়। আমরাও ঐক্যমতে পৌঁছতে সক্ষম হই। ধর্মনগরে কমলজিৎ সিং (যিনি পরবর্তী সময়ে টেরিটরিয়েল কাউনসিলে মনোনীত কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে নিয়োজিত হ'ন) এর সহযোগিতায় আমরা ধর্মনগর হিতসাধনী সভার সাথে কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণে সমর্থ হই। এই সময় দেখা যায় জনগণের সব স্তরের মানুষই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুকূলে। ধর্মনগরে নাথ সম্প্রদায়, মণিপুরী সম্প্রদায়ে ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। এদের সকলেরই সমর্থন লাভে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম। উল্লেখ করার মত বিষয় হ'ল সে সময়টা ছিল ত্রিপুরার রাজনীতিতে যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। আমাদের প্রভাব সরকারী মহলেও দাগ কেটেছিল। তাঁরা মনে করতেন শাসন ক্ষমতায় যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে — সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে সেখানে আমাদের দাবী সর্বাগ্রে গৃহীত হবে। আমরা শাসনক্ষমতা বিন্যাসে ও নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে সক্ষম হ'ব। সে জনাই স্বয়ং মহকুমা শাসকের বাড়ী থেকেও আমাদের আমন্ত্রণ আসত এমনভাবে যে সেখানেও আমাদের উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত ছিল না।

সর্বশেষ ধর্মনগর প্রচার অনুষ্ঠানে কাজ শেষ করে ধর্মনগর শহর হয়ে আমরা মুরি স্টেশনে এবং রেলে আখাউড়া এসে আগরতলা পৌঁছি। বলা বাহুল্য যে তখনও পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়নি। তবে চেক-পোষ্ট উভয় সীমান্তে বসেছে। এদিকে এই দু তিন মাসে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে নতুন মোড় নিয়েছে সে সম্পর্কে আমরা মোটেই অবহিত হবার সুযোগ পাই নি। সাংগঠনিক দুর্বলতার (তাছাড়া বর্তমান রেডিও, টেলিভিশন এবং ডাক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না) জনাই আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে চলেছিলাম। ইতিমধ্যে পার্টি বে-আইনী

ঘোষিত হয়েছে। রাজধানী আগরতলায় পার্টি কর্মীদের উপর স্বৈরাচারী সরকারের আক্রমণ শুরু হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিলাম না। কমঃ বীরেন দত্ত ও অঘোর দেববর্মা আত্মগোপন করে কোথায় আছেন আমরা জানতাম না। এবং আমাদের জন্য কোন খবর রেখে যাওয়ার যে প্রয়োজন ছিল - সে কর্তব্যবোধও তাদের ছিল বলে মনে হল না। সংগঠন ছিল, কর্মীরা ছিল আমাদের বন্ধু ও সহকর্মী প্রভাত রায় ও বংশীঠাকুর শহরেই ছিলেন। যে কোন গুরুতর প্রশ্নে আমরা তাদের দু'জনের সঙ্গে সর্বদা পরামর্শ করে কাজে হাত দিয়েছি। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হ'ল কেন? এ প্রশ্নের আজও সদুত্তর আমরা খুঁজে পাই নি। কাজেই আমরা আগরতলায় পৌঁছে কোন খবর না পেয়ে একটু হতচকিত হয়ে পড়লাম এবং কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পরের দিন বিকেলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। সন্ধ্যায় থানা লক-আপে কিছুক্ষণ পরেই ধরা পড়ে উপস্থিত হলেন প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর। সেই রাত থানা লক্ আপে থাকতে হ'ল। পরের দিন নিয়ে যাওয়া হ'ল আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে। এভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অধ্যায়। শুরু হ'ল পুলিশী অত্যাচারের নির্মম অভিযান ও তার ইতিহাস। ঘটনাবলীর একটু বিস্তারিত সমালোচনা না করলে বা আন্দোলনের ত্রুটিপূর্ণ দিক তুলে না ধরলে ঘটনা প্রবাহের ধাবা ও প্রকৃতি অস্পষ্ট থেকে যাবে। প্রথমে বলতে হয় সংগঠনের কথা। সংগঠন বলতে এখানে পার্টি সংগঠন, প্রজামণ্ডল ও জনশিক্ষা সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের কথা বলতে চাচ্ছি। কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে কুমিল্লা জিলা পার্টির একটি ইউনিট এবং কুমিল্লা পার্টির নেতৃত্বের অধীনে কাজ করে চলছিল। কার্যতঃ পরিচালিকা শক্তি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে কুমিল্লা জিলা পরিষদ— যার নেতৃত্বে ছিলেন সুবোধ মুখার্জি। কিন্তু কার্যতঃ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিট-কে একটি পৃথক সত্ত্বা হিসাবে দেখতেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাবলী নিয়ে মোটেই কোন চিন্তা বা ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে আসতেন বা তার প্রতিনিধি বিশেষ করে পি. সি. সদস্য যোগব্রত সেন কয়েকবারই এসেছেন — কিন্তু সেটা ছিল অনেকটা নিয়ম মাফিক। কাজের কাজ কিছুই হ'তো না। কুমিল্লা পার্টি মনে করত কমঃ বীরেন দত্তই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে পার্টির সংগঠন গড়ে তুলবেন এবং সেই ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করবেন। কমঃ বীরেন দত্তের বিশ্লেষণ ভঙ্গি বলিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ ছিল। তিনি ধরতে পেরেছিলেন সামন্ততন্ত্রের শাসন যন্ত্রের মধ্যে প্রজাদের দুরবস্থা। তিনি বুঝেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতির মধ্যে কো-রিলেশন ফোরসেস কি? তিনি বুঝেছিলেন অনুন্নত ত্রিপুরী উপজাতিদের জাতিসত্ত্বা বিকাশের সূচনায় তার মানসিকতা কিভাবে আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত করতে হবে। তিনি এ কথাও স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে প্রজা আন্দোলন শুধু রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় প্রজা আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু একথাও সত্যি যে তিনি অন্য উপজাতি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বা তাদের পরিবেশগত কাঠামো ও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে যে বাধা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করছে তার সম্যক উপলব্ধি বা বিশ্লেষণ করে উঠতে পারেন নি। সর্বশেষ সমস্ত উপজাতিদের ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে থেকে রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে যে এক সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

গড়ে উঠেছিল তার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ আমাদের ছিল না। প্রথমেই বলতে হয় ত্রিপুরীদের সাথেই আমরা বিশেষভাবে মিশবার সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম এবং সে জন্যই আন্দোলনের পরিধি শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনুন্নত উপজাতি, নিপীড়িত সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে স্বতঃস্ফূর্ত ধারা আবাহমান যুগ ধরে চলে আসছে সে ধারা ও সে পদ্ধতি সংগঠিত হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। পরবর্তী ত্রিপুরার ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয়। গোলাঘাটির ঘটনা, তাইতুন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আন্দোলন এবং এমন কি পরবর্তী সময়ে সশস্ত্র সংগ্রাম এই সাক্ষ্যই বহন করে। আমার মতে বীরেন দত্ত সুপরিকল্পিত ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের গতিধারা অনুসরণ করে চলতে পারলে অনুন্নত জাতি ও সম্প্রদায়ের একটা উচ্চমানের সমাজ সংস্কার কাজে সফলকাম হতো। হঠাৎ করে আত্মগোপন করার পেছনে এই যুক্তি হয়ত কাজ করে থাকবে। কিন্তু তা হলেও পার্টি নিয়ম বিধি অনুযায়ী এবং পার্টি ইউনিটের সাথে আলোচনার ক্রমে তাঁর কাজ করা উচিত ছিল।

বীরেন দত্ত মুসলিম প্রজাদের অবস্থাও সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সামন্ততন্ত্রের নিগড়ে যে তারাও নিষ্পেষিত হচ্ছিল তার মূলসূত্র তিনি ঠিকই মূল্যায়ন করেছিলেন। কিন্তু পার্টি সংগঠন তো এই বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি। কাজেই পুলিশ আক্রমণের মুখে আমাদের সুসংবদ্ধ ও সুনিপুণভাবে, ভাবাবেগ বর্জিত হয়ে এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক নিজেদের দৃঢ় করে লৌহ দৃঢ় মনোবল ও মানসিকতা নিয়ে আত্মগোপন করে কাজ করতে হ'ত প্রশাসনের সর্বস্তরের কাঠামোতে পরিবর্তন আনবার জন্য। কিন্তু নেতৃত্ব সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হ'ল। এ চিন্তা আমাদের ছিল যে, আক্রমণ আসবে এবং তাকে মোকাবিলা আমাদের করতে হবে আত্মগোপন করে সংগঠনের কাজ চালিয়ে। প্রজামণ্ডলকে অবলম্বন করেই জনগণের মধ্যে চলাফেরা করার সুযোগ ছিল এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের ফলে ত্রিপুরীদের মধ্যে যে গণ-চেতনার উন্মেষ হয়েছিল তাও আমাদের সহায়ক হ'ত আত্মগোপন করে কাজ করতে। অবশ্য এ ছিল এক কঠিন কাজ এবং কম্যুনিষ্ট আদর্শে দীক্ষিত কর্মীর কাজ। কিন্তু দেখা গেল প্রাথমিক এই কাজগুলোর কোন কিছুই আমরা করতে পারলাম না। এবং বীরেন দত্ত যে ভূমিকায় ছিলেন তা যথাযথ পালন করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি নিজে আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল বলেই আমার বিশ্বাস। কোন অবস্থায় পার্টি সংগঠনকে এবং বিশেষ করে পার্টি ইউনিট -এর কমিটিকে না জানিয়ে বা আমাদের সকলের কাছে কোন নির্দেশ না রেখে সেদিন শুধু কমঃ অঘোর দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যে, আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিলেন তা আদৌ সংগঠনের দিক থেকে মোটেই ইতিবাচক ছিল না। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকেও এই কাজকে গর্হিত বলা চলে। তবে কমঃ অঘোর তাঁর নিজ প্রচেষ্টায় যা করেছেন তা বাম-বিচ্যুতিমূলক হলেও ত্রিপুরার তৎকালীন পরিবেশে স্বাভাবিক বলা চলে। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ধারাকে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করেছেন — গোলাঘাটির হাঙ্গামার সময় এবং রাজধানীর বুকে বিশাল জনতার সমাবেশে নেতৃত্ব দিয়ে।

পার্টি সংগঠনের দুর্বলতা ও তাঁর নেতৃত্বের দোদুল্যমানতার কথা বললাম। এখন

প্রজামণ্ডলের কথায় আসা যাক। প্রজামণ্ডল ছিল একটি প্লাটফরম। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি এই প্লাটফরমে মিলিত হয়ে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে সামন্ততন্ত্রের উপর আঘাত হেনে শাসন যন্ত্রে পরিবর্তন আনার ও তার মাধ্যমে প্রজাসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিতে অগ্রসর হচ্ছিল। এ ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের প্রতীক। আমরাই ছিলাম তার চালিকা শক্তি। কাজেই যে মুহূর্তে আমরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলাম ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লাম তখনই আন্দোলনে ভাটা পড়ে গেল। এই আন্দোলনে (গণ আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক দাবী সনদ নিয়ে যে আন্দোলন) পরবর্তী সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টি এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। যার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছিল 'গণমুক্তি পরিষদ'।

প্রজামণ্ডল ছাড়া জনশিক্ষা সমিতিও গড়ে তুলেছিল এক বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন। যা মূলতঃ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। এই শিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণের জন্য। এটাকে এক গণ-অভ্যুত্থান বলা চলে। সামাজিক কুসংস্কার, মহাজনের অত্যাচার, অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযানও ছিল এই আন্দোলনেব পর্যায়ক্রমিক আত্মপ্রকাশ। আর এই শিক্ষা আন্দোলনই ছিল উপজাতি যুবকদের জাতীয় আত্মচেতনা ও জাতিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার ধারক ও বাহক। স্বভাবতঃই তা প্রভাবিত হয়েছিল আমাদের সংস্পর্শে এসে। কিন্তু আমাদের নেতৃত্বের দুর্বলতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কারণে আমবা এই আন্দোলন থেকেও - সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আমাদের পলায়নী মনোবৃত্তি আমাদের কাজে প্রমাণিত হ'ল। প্রশ্ন দাঁড়াল ত্রিপুরার তৎকালীন অবস্থায় আমরা জনগণের সামনে একটি পরিণত কার্যক্রম উপস্থিত কবতে পারলাম না যা কিনা একটি গণতান্ত্রিক মোর্চার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে আরও প্রসার ঘটাতে পারত।

অবশ্য পরবর্তী সময় অধিক নিষ্ঠাবান এক কর্মীদল যাদের মধ্যে ছিলেন গৌরাঙ্গ দেববর্মা, দ্বিজেন আচার্য্য, অপূর্ব রায়, আতিকুল ইসলাম — জনগণের কাজ করে প্রমাণ করেছিলেন যে, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হ'লে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন। বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করতে পারলেই গণ আন্দোলনকে জাতীয় মূলস্রোতের সাথে মিলিয়ে দেয়া যায়। সঙ্কীর্ণতাবাদ পরিহার করে জাতিসত্তা বিকাশের উপাদানকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারায় অগ্রসর হতে পারলে আত্মনিয়ন্ত্রণেব মূল লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভবপর হয়। কিন্তু আমরা সে কাজে সফল হতে পারিনি। কেন পারিনি সে প্রশ্ন আজও বর্তমান এবং আমাদের চেতনা বিকাশের এক অসমাপ্ত অধ্যায়।

মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্। সাতদিন পরে কমঃ বীরেন দত্ত ধরা পড়ে আমাদের সাথে জেলে এসে মিলিত হ'লেন। এবং তাবপর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে (আসামে কোন এক জেলে) অন্যত্র আমাদের কাছ হ'তে রাত্রের এক অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন ননীকর্তা।

সে সময় দেওয়ানী আমলের যুগ চলছে। রাত্র ১১টার সময় তিনি স্বয়ং পুলিশ নিয়ে

আমাদের জেলের যে ঘরে অবস্থান করতাম সেই ঘরের দরজা খুলে বীরেনকে জোর করে নিয়ে গেলেন। আমরা আপত্তি করেছিলাম এতরাত্রে কখনও এক জেল থেকে অন্য জেলে বদলী হওয়ার কোন নজীর নেই। এমন কি ব্রিটিশ আমলেও আমরা কখনও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই নি। কাজেই এই ঘটনা সেদিন আমাদের মনে ভীষণ ভাবে দাগ কেটেছিল এবং এই ঘটনা আমাদের ফ্যাসিষ্ট আমলের অত্যাচারের কথাই মনে করিয়েছিল।

বীরেন দত্ত ছিলেন অসুস্থ। একথা আমরা জোর দিয়ে বললাম এবং ডাক্তারের অনুমতি পত্র (ছাড়পত্র) নিতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু করা হল না। পরে জেনেছিলাম ডাঃ দীগেন্দ্র ব্যানার্জি (তখন তিনি জেল ডাক্তার ছিলেন) ফিটনেস্ সার্টিফিকেট দিতে রাজী হন নি। তা সত্ত্বেও একটি অসুস্থ ব্যক্তিকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হ'ল — সেই অন্ধকার রাত্রে। বৃটিশ রাজত্বেও বহুবার পুলিশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনও হয়েছে সারা রাত্র পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছি। কিন্তু ভোর না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ঘরে প্রবেশ করেনি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটতে পারল।

সব কিছু সত্ত্বেও একথা প্রমাণিত হ'ল ত্রিপুবা রাজ্যে সংগঠনগত ভাবে আমরা কতটা দুর্বল ছিলাম। আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল জনশিক্ষা সমিতির জনপ্রিয়তা ও প্রজামণ্ডলের মাধ্যমে উজ্জীবিত গণতান্ত্রিক চেতনা।

জেলখানাব গতানুগতিক জীবন যাত্রার মধ্যে আমাদের নিষ্প্রভ জীবনকে সজীব করে রাখত বংশী ঠাকুর। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা যখন তিনি বর্ণনা করতেন এবং ভবিষ্যতের আশার বাণী যখন বর্ণনা করে যেতেন তখন আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। বংশী ঠাকুর ছিলেন একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। ছোটবেলা যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট স্পোর্টসম্যান। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি চিটাগাং ডিভিশন এ টেনিস চ্যামপিয়ান হ'ন। সরকারী চাকুরীও তিনি করেছেন — খোদ পুলিশ অফিসে। চাকুরী স্বেচ্ছায ত্যাগ কবেছেন। ছোটবেলা কাটিয়েছেন রাজ অন্তঃপুরে। চাকুরী ছেড়ে পদব্রজে ভারতবর্ষের বহুস্থান ঘুরেছেন। সার্কাস দলে ছিলেন কিছুদিন, বার্মা মুলুকেও গিয়েছেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানকার ভাষা আয়ত্ব করেছেন। মণিপুরী, হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী ও ককবরকে তাব দখল ছিল। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্র কবিতা কেউ ককবরক ভাষায় অনুবাদ করলে তার পরিশুদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হত। ভবঘুরে জীবন শেষ করে তিনি এসে আবার যোগ দিলেন চাকুরীতে। তবে এবাব পুলিশ বিভাগে নয়, এবার শিক্ষক হিসাবে — ত্রিপুরা বোর্ডিং-এ। এখান থেকেই শুরু হয় তার বাজনৈতিক জীবন।

পুনরুল্লেখ হ'লেও বলতে হয় যে, তিনি গান রচনা করে তাতে সুব দিতে পারতেন। তাঁর স্বভাব ছিল অমায়িক, সদালাপী এবং অনেকটা আত্মভোলা গোছের। এমন দিন গেছে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন বাজার করতে — কিন্তু দেখা গেল খালি থলি নিয়ে ফিরেছেন। কোন বন্ধুর সাথে আলাপে বসে সেখানেই পয়সা খরচ করে বন্ধুকে আপ্যায়ন করে বাড়ী ফিরেছেন শূন্য হাতে।

এমন লোকের সংস্পর্শে জেল জীবনে দিন কাটিয়েছি মোটামুটি ভালভাবেই। জীবনের অভিজ্ঞতা যখন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করতেন এবং ভবিষ্যতের আশার বাণী যখন শোনাতেন তখন আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। ত্রিপুরা সম্পর্কে নানা গল্প, রাজবাড়ীর কাহিনী এবং সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সব কিছু থেকেই শিক্ষণীয় ছিল এবং আমরা তা আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করতে চেষ্টা করতাম। তার কাছেই জানতে পারি রতনমণিকে (রিয়াং বিদ্রোহের নেতা) কি নৃশংস ভাবে রাজবাড়ীর কয়েদখানায় হত্যা করা হয়। তাঁর কাছেই শুনেছি রিয়াং বিদ্রোহের কাহিনী; ত্রিপুরার সামন্ত প্রভুদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী; রাজবাড়ীর অন্দর মহলের বিলাস ঐশ্বর্যের দিন যাপনের কথা, ব্যাভিচারের কথা। এখন সে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারলে — আজ আমরা অনেক ভুল তথ্যের হাত থেকে বেঁচে যেতাম এবং তা হ'তে পারত ত্রিপুরার মহান সন্তানের এক জীবন আলেখ্য। জেল খানায় বসে আমরা ভবিষ্যতের কিছু পরিকল্পনা রেখা এঁকেছিলাম। তার মধ্যে যেমন ছিল বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা এবং বিশেষ করে একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প। এই কাগজের নামকরণও আমরা করেছিলাম 'চিনি-হা'। সুখের কথা এই কাগজ প্রয়াত কমরেড্ প্রভাত রায়ের নিজস্ব প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ত্রিপুরার মাটিতে সাংবাদিক জগতে এই কাগজ এক অমূল্য অবদান রেখে গেছে। সে দিনের রাজনীতি, সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশে এই কাগজ এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। মনে রাখতে হবে এ ছিল তার একক প্রচেষ্টা এবং আজকের মত বিজ্ঞাপনের পয়সাও পাওয়া যেত না।

প্রভাত রায় ছিলেন ধীর স্থির ও গম্ভীর। প্রভাতের জন্ম হয়েছিল এক অভিজাত পরিবারে এবং বড়ও হয়েছিলেন সেই পরিবেশে। ছাত্র অবস্থায় তিনি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বি, সি, এল. অ্যাক্ট এ বেশ কিছুদিন জেলে আটক ছিলেন এবং মুক্তি পেয়ে ত্রিপুরায় প্রজামণ্ডলের নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত থেকে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। তাঁর সহকর্মী ছিলেন যোগেশ ঠাকুর, বংশী ঠাকুর, বাদশা মিঞা, বীরেন দত্ত এবং আরও অনেকে। তার জীবনের সবচেয়ে এক গৌরবময় অধ্যায় হ'ল 'চিনি-হা' পত্রিকার সম্পাদনা ও একক চেষ্টায় কাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। কর্মরত অবস্থায় তিনি সাব্রুম যাবার পথে এক মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমাদের জেলে অবস্থানকালেই গোলাঘাটির (১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে) ঘটনা আমাদের দেখবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু এই ঘটনার সাথে জড়িত অনেক আদিবাসী ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের লোক পুলিশের হাতে ধৃত হয়ে জেলে আসেন এমন অনেকের সাথে আমাদের আলাপ হয়েছে। তাদের মুখে ঘটনার যে বিবরণ আমরা পেয়েছি তা শুধু নির্মম পুলিশী অত্যাচারের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনাই নয় — তা ছিল পুলিশের এক পরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল — জনসাধারণকে উচিত শিক্ষা দেওয়া ও মহাজনদের অত্যাচার ও জুলুম বজায় রাখতে সাহায্য করে। ১৯৪৮ সালে দানাশস্য ভাল হয়নি। গৃহে গৃহে ছিল অনাহার, দুর্ভীক্ষের করাল ছায়া। এই অবস্থায় গ্রামবাসী মহাজন হরিচরণ সাহার ধানের নৌকা আটক করে। এই ধান যাচ্ছিল পূর্ব

পাকিস্তানে। গ্রামবাসীরা দাবী করেছিল এই ধান তাদের মধ্যেই বিতরণ করা হোক। আগামী বছর সুদসহ ফসল তোলার পর শোধ করে দেবে। হরিচরণ সাহা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে গোপনে পুলিশকে খবর দিলেন এবং লুটের মামলা দায়ের করলেন। বিশালগড় থানার ও.সি মিহির চৌধুরী এক দল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। ওদিকে ধান পাবার আশায় বহু বুভুক্ষু জনতা ঘাটে এসে জমায়েত হয়। এই অবস্থায় আতঙ্কিত পুলিশ অফিসার মিহির চৌধুরী হরিচরণ সাহার স্বার্থ রক্ষার জন্য গুলির আদেশ দেন। বহু লোক হতাহত হল। কত লোক হত হয়েছিল সেই সংখ্যা কোনদিনই কেউ জানবে না। কিন্তু ভীত জনতা যারা দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল তাদের অনেকেই গুলির আঘাতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং পুলিশের হাতে ধৃত হয়ে সাজানো ধান লুটের মামলায় আদালতে সোপার্দ হন। এধরণের বেশ কয়েকজনের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সকলেরই গুলির আঘাত ছিল শরীরের পেছনে পৃষ্ঠদেশ। একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে জনতার দিক থেকে পুলিশের উপর আক্রমণের কোন পরিকল্পনা ছিল না। তারা ক্ষুধার্ত এবং ধান পাওয়ার আশায় নৌকাঘাটে জমায়েত হয়েছিল।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারের উপর এবং প্রশাসনের উপর তাদের বিশ্বাসের চির ধরে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি দুবর্ল ও অসংগঠিত ছিল ঠিকই। তবুও আহতদের চিকিৎসার জন্য পি আর সি ইউনিট গোলাঘাটি অঞ্চলে যায় এবং বে-আইনী পার্টির একদল কর্মীদলও কলিকাতা থেকে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করেন। এই সময় কমরেড সুখবিন্দু সেন (ওরফে কানু সেনের) অবদান এবং বিশেষ করে কর্মীদের সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা এবং পি আর সি ইউনিটকে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা বিশেষভাবে মনে রাখার মত।

গোলাঘাটি ঘটনা নিয়ে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য কমঃ অঘোর দেববর্মার বিরুদ্ধে করা হয়েছে। কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। সব চেয়ে বড় কথা তিনি জনতার মধ্যে ছিলেন এবং জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধকে তার নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে একটু সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। জনতা কোন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দান লুঠ করতে যায় নি। তারা গিয়েছিল খাদ্যের দাবী নিয়ে মহাজন হরি সাহার কাছে ধান আনতে। হরি সাহা কথাও দিয়েছিল ধান দেবার। কিন্তু বেশী মুনাফার লোভে সে বিশালগড় থানার ও. সি. মিহির চৌধুরী সাথে ষড়যন্ত্র করেও তাদের সাহায্য নিয়ে ধান ভর্তি নৌকা নিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করে। ক্ষিপ্ত জনতা ধান দাবী করলে পুলিশ অতর্কিতে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে এবং বহু লোক এর ফলে হতাহত হয়।

আমাদের অবশ্যই বলতে হবে এ ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। জন-শিক্ষা সমিতির শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনের প্রভাবে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মনে একটি জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় এবং অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানবার পদ্ধতিগত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাও এই ধান দাবী করার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। তা ছাড়া ছিল কম্যুনিষ্ট কর্মী অঘোর দেববর্মার প্রভাব।

পুলিশের দ্বারা এই নৃশংস হত্যাকান্ডের ফলে সমস্ত উপজাতি এলাকায় একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। প্রশাসনের ভাবমূর্তি তাদের কাছে নগ্ন হয়ে পড়ে। ত্রিপুরা প্রশাসনে তখন একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল—রাণী রিজেন্টের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়।

গোলাঘাটি ঘটনায় তাঁদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ পরবর্তী সময় আমার পিতৃদেব এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, নন্দলাল কর্তা (দেববর্মা) যিনি সে সময় মন্ত্রী ছিলেন—তাঁর এই ঘটনার প্রতিবাদে পদত্যাগ করা উচিৎ ছিল।

জেলখানার একঘেয়ে জীবনে কোন বৈচিত্র ছিল না। পড়াশুনারও কোন সুযোগ ছিল না। একমাত্র কয়েদীদের সাথে আলাপ আর দু-এক জন পুলিশের সাথে আলাপ করে সময় কাটাতে হ'ত। পুলিশের সাহায্যে বাইরে যে দু'চারজন কমরেড্ ছিল তাদের সাথে মোটামুটি একটা যোগসূত্র রক্ষা করার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আমাদের জীবনে স্তব্ধতা বিরাজ করলেও বাইরের দুনিয়া স্বভাবতঃই ছিল চলমান। গণতান্ত্রিক ভাবধারাও ছড়িয়ে পড়ছিল পাহাড়ী অঞ্চলে। গোলাঘাটি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল সমগ্র এলাকা। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে। কমঃ অঘোর দেববর্মার ও হেমন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল সংগঠিত ভাবে রাজধানী আগরলতা শহরে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে শ্লোগান দিতে দিতে উমাকান্ত ময়দানে এসে সমবেত হয় এবং গণতান্ত্রিক দাবী সমূহ পেশ করে। আবার দীপ্ত মিছিল করে দুর্গাচৌধুরী পাড়া অভিমুখে চলে যায় এবং সেখানে থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে জনতা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। এই প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় জন-শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দের দ্বারা। তারা সকলের পলাতক অবস্থায় শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই মিছিল ও সমাবেশের বৈশিষ্ট্য ছিল পুলিশ ও প্রশাসনকে হতবাক করে মিছিল সুশৃঙ্খল ভাবে শহর প্রদক্ষিণ করে এবং উমাকান্ত ময়দানে সম্মিলিত হয়ে এদের গণতান্ত্রিক দাবী সনদ পেশ করে আবার সুশৃঙ্খল ভাবে চলে যাওয়া। পুলিশ অঘোর দেববর্মা বা হেমন্ত দেববর্মাকে ধরবার সুযোগ পায়নি এবং এও বলা যায় ধরবার মত সাহসও তাদের ছিল না।

আমরা জেলখানা থেকেও এই প্রদীপ্ত মিছিলের আওয়াজ শুনে উৎসাহিত হই। গণতান্ত্রিক দাবীর মধ্যে বন্দী মুক্তির দাবিটিও ছিল একটি প্রধান শ্লোগান। তবুও সত্য বলতে কি এই ঘটনার তাৎপর্য আমরা তখনও বুঝে উঠতে পারি নি।

আগরতলায় সংগঠিত মিছিলের পরই শুরু হয় সরকারের প্রতি আক্রমণ। উপজাতি সম্প্রদায়কে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য প্রশাসন তখন ক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে উঠে এবং সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গোলাঘাটি ঘটনা গণচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। প্রশাসনের কদর্য হিংস্ররূপ উপজাতিদের সামনে ফুটে ওঠে। উপজাতিদের উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য, তাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য রাজ্যব্যাপী বিশেষ করে সদর, কমলপুর, খোয়াই, বিলোনীয়া, সোনামুড়া প্রভৃতি এলাকায় প্রকৃতপক্ষে মিলিটারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। গণ-মুক্তি পরিষদ, জনশিক্ষা সমিতির কর্মীদের উপর এবং এলাকার সমস্ত মানুষের উপর নারী পুরুষ নির্বিশেষে পুলিশ ও মিলিটারীর তান্ডব

চলতে থাকে। শান্তি গণ-মুক্তি পরিষদ গড়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না থাকাতে আমার পক্ষে বিশেষ কিছু বলা সমীচিন হবে না। ওকে যথটা মনে পড়ে চীনে ফৌজের কথা, লঙ - মার্চের কথা আমাদের মনে ও চেতেনায় প্রভাব ফেলে ছিল। প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনায় গণ-ফৌজের আদর্শে গণ-মুক্তি পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের উপরও চলে অন্যায় জুলুম। কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শক্তি মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এমনকি আমাদের পরিচিত বন্ধু-স্থানীয় হাবুল ব্যানার্জিও মুসলিম বিরোধী অভিযানে অংশ নেন। রাজ্যে তখন চলছিল খাদ্যাভাব। একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীরাই ছিল। ধান উৎপাদনে উন্নত মানের চাষী। ধান কালেকশন-এর নামে শুরু হয় তাদের (কৃষকদের) বাড়ীতে বাড়ীতে হানা। এবং এই কাজে হাবুলবাবু পুলিশকে সমস্ত রকমভাবে মদত দিয়েছিলেন। তার নিজ খামার বাড়ী (রুদ্রসাগরে অবস্থিত) প্রকৃত পক্ষে গড়ে উঠেছিল। একটি জোট বাট এরসিন্যাল যা পুলিশের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। একথা বিশদ ভাবে উল্লেখ করলাম এ কারণেই যে, এই লোকই কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং একজন সহযোগী হিসাবেও গণ্য করা হত। মুসলমান প্রজাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বিশেষ করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে তখন আগরতলার সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে এসে বন্দী করে রাখা হত। সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অথচ এদের একটা বড় অংশই পরবর্তী সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসে এবং সমস্তরকম ভাবে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এ সময়ের অন্য একটি ঘটনাও আমাদের মনে রাখা দরকার, বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের লোক তখন কংগ্রেসের আশ্রয়ে চলে যায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারের সাথে সহযোগিতা ক্রমে উপজাতিদের উপর আক্রমণে উৎসাহ দিয়ে চলে। ফলে উপজাতি ও বাঙ্গালী দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আলোচনার সূত্রপাত হয় নি। এই আলোচনা হওয়ার দরকার ছিল—প্রগতি আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য এবং তার দুর্বলতা দূর করে তাকে আরও সজীব করে গড়ে তুলবার জন্য।

আমি জেলে থাকাকালীন সময়েই দশরথ দেববর্মা, সুধন্ব দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়ে উপজাতি অঞ্চলে জন-শিক্ষা আন্দোলনের ভূমিকা আরও বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে। সমস্ত পার্বত্য এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে এক তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৯৪৮ -এর শেষে অথবা ১৯৪৯ এর প্রথম দিকে প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর জেল থেকে মুক্তি পান। জেলে তখন আমি নিঃসঙ্গভাবে সেলে বন্দী। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জেলে পাহারারত কনষ্টেবলদের সাথে যোগ এবং তাদের সাহায্যে গোপনে বাইরের কমরেডদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা কিছুটা পরিমাণে চালু রাখা। কনষ্টেবল ছাড়া আমাদের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন জেল কম্পাউন্ডার শঙ্কর দেববর্মা। এক সময় জেলে যাবার প্রথম দিকে স্বয়ং জেলার ছিলেন আমাদের সহায়ক ও আমাদের প্রজা আন্দোলনের সমর্থক। তাঁর নাম হল গোপীকৃষ্ণ দেববর্মা। আমাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ সরকারের কাছে অজ্ঞাত ছিল না— ফলে এই অপরাধে তিনি চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। এ রাজ্য নিয়ম মাফিক ভারতভূক্তির পরও তিনি আর কোন সরকারী চাকুরীতে সুযোগ পান নি এমন কি পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কারী বা

পরোক্ষে সাহায্য কারীদের যে পেনসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—সে সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন—যেহেতু কোন লিখিত প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেন নি। অথচ নিয়মবিধি সে সময় এমনই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল যে কোন অভিযোগ তখন লিপিবদ্ধ আকারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হত না। আমি নিজে এ ব্যাপারে সাক্ষী এবং লিখিত সার্টিফিকেট দিয়েও গোপী দেববর্মাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি নি। কারণ আমার সার্টিফিকেটও কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট নয় বলে লিখে জানালেন এবং সরকারী আদেশনামার নকল চেয়ে দরখাস্ত ফেরৎ পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সেরূপ কোন আদেশনামা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

জেল জীবনের বিস্তারিত অধ্যায় লিখতে বসি নি। আর তা লেখার মতো লেখনীর সুনিপুণতার অভাবও আমার আছে। তবুও বলতে হয় সাধারণ কয়েদীদের জীবনধারার মধ্যেও একটি ছন্দ ছিল। তাদের মধ্যে দেখেছি সুখ দুঃখের আলোড়ন ও জীবনের স্পন্দন। গোপী দেববর্মা চাকুরী থেকে অপসারিত হবার পর আমাদের জেলের হয়ে থাকেন সুরেন্দ্র মজুমদার— তিনি আসেন সরাসরি পুলিশ সার্ভিস থেকে। তিনি ছিলেন খুবই ভাল লোক। তিনি ছিলেন অমায়িক ও স্নেহ পরায়ণ। আমাকে তিনি স্নেহের চোখেই দেখতেন এবং আমার সাথে ভাল ব্যবহারই করতেন। এর বিশেষ কারণ হল তিনি ত্রিপুরার কাছাকাছি অঞ্চলের অর্থাৎ মহারাজার জমিদারীর ফেনী অঞ্চলের লোক। সামন্ততন্ত্রের কু-শাসনের ফল তাকেও ভোগ করতে হয়েছে। জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন তদানীন্তন এ রাজ্যের চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ ঘোষ। ডাঃ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। এক সময় তিনি নেপালের চীফ সারজেন ছিলেন। তাঁর বাড়ী চট্টগ্রামে। ডাঃ ঘোষ একটু দেশপ্রেমিক ছিলেন। শ্রদ্ধেয় অম্বিকা চক্রবর্তী যখন আগরতলায় এসেছিলেন তখন তিনি অম্বিকাদার সাথে দেখা করেছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চলে বন্ধুত্ব-পূর্ণ আলোচনা। আমাদের তিনি অনেক সময় উপদেশও দিতেন। একবার আমরা দাবী করে বসলাম যে সাধারণ কয়েদীরা যে কম্বল ব্যবহার করে সে কম্বল আমরা ব্যবহার করব না। তিনি শুধু বললেন তা হলে একটি বাস-গাড়ীতে একজন সাধারণ গ্রামের মানুষ উঠে বলে কি তোমরা সেই বাসে চড়বে না। কম্বল শীত নিবারণের জন্য এ জিনিষ তো সকলেই ব্যবহার করতে পারে। আমরা তখনও আপত্তি করলাম। তখন তিনি আদেশ দিলে আমাদের প্রত্যেককে দুটি করে বড় চাদর দিয়ে কম্বলের কভার করে দিতে। আমরা কিন্তু সেদিন খুবই লজ্জিত হয়েছিলাম এবং তাঁর ব্যবহারে মনে মনে খুশী হয়েছিলাম। কম্বল আমরা খুশীমনেই গ্রহণ করলাম। এবং এ জিনিষে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ও প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর মধ্যে তুলনা তুলে ধরে আমরা যে মানুষে পার্থক্য তুলে ধরে নিজেদের মনের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়েছিলাম সে জন্য লজ্জা অনুভব করেছিলাম।

জেলে বন্দীদের কোন উৎসব পালনের ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র দুর্গাপূজা ও ঈদ উপলক্ষে একটু ভাল খাওয়া বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ী থেকে যদি কোন খাবার আসে তবে তা কয়েদীরা ব্যবহার করতে পারত। আর সে সময় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও একটু ভাল খাবার দেওয়া হত। তবে তা কোন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে না। ঈদ উৎসবের সময় জেলে ছিলাম। দেখেছি কয়েদীরা কি যত্ন করে রান্না করত ও নিজেরা একত্রে বসে থাকলে মিলে মিশে খাওয়া দাওয়া

করত। এটুকু আনন্দই উপভোগ করার মত। তখন সাধারণ কয়েদীদের খুবই পরিশ্রম করতে হত। জেল কর্মচারীদের বাড়ীতে কাজ করা, রান্নার জন্য পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনা, বাগানে সজ্জী উৎপাদন, গোয়াল ঘরে গরুর সেবা, বাঁশ বেতের কাজ, তাঁত ঘরের কাজ এ সবই তাদের করতে হত এবং সে জন্য কোন সুযোগ সুবিধার বা বাড়তি কিছু টাকা পয়সা দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল না। তবে ব্রিটিশ আমলে অন্যান্য জেলে যেমন নিপীড়ন চলত সে রকম কোন নির্যাতন আগরলতা জেলে দেখি নি। খাওয়া দাওয়ার পরিমাপ ভারতবর্ষের সব জেলের অনুরূপই ছিল। কয়েদীদের দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্ত আচরণ বিধি মেনে চলতে হত তাও ছিল একই রকম। শুধু ব্যবহারে তারতম্য ঘটত জেল কর্মচারীদের ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারে ও আচরণের পার্থক্যের মধ্যে।

আগরতলা জেলে তখন কোন ত্রিপুরী কয়েদী দেখিনি। এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এঘটনা প্রমাণ করে ত্রিপুরীদের মধ্যে তখন অপরাধ প্রবণতা খুবই কম ছিল। একমাত্র দেখছি চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে দু'চার জন কয়েদী ; তাও কোন চুরি করা জনিত অপরাধের জন্য নয়। উপজাতিদের মধ্যে চুরি করার মত মানসিকতা তখন একেবারেই ছিল না।

আমার জেল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে—১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে অবশ্য এটা বেকসুর খালাস নয়। আমাকে বাড়ীতে নজরবন্দী থাকতে হয় অনেকদিন। সপ্তাহে দু'দিন থানায় হাজিরা দিতে হত। আর আমার গতিবিধির উপর ছিল বাধানিষেধ। এ সবকিছু এড়িয়ে এবং দু-একজনের সহায়তায় স্থানীয় কর্মী যারা আগরতলায় থাকতেন—তাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। বিশেষ করে কমঃ আতকুল ইসলাম, গৌরাঙ্গ দেববর্মা, দ্বিজেন আচার্য প্রমুখ কর্মীদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। আমার সহধর্মিনীকে (সাহানা সেনগুপ্ত) সঙ্গে নিয়ে গোপনে বংশী ঠাকুরের সাথেও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখি এবং পার্বত্য অঞ্চলে যে প্রবল অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তারও খবরাখবর রাখতে চেষ্টা করি। এই সময় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন কমঃ দশরথ দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, সুধন্ব দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা। একমাত্র অঘোর দেববর্মা-ই তখন কম্যুনিষ্ট বলে নিজেকে প্রচার করেছেন এবং পরিচয় দিয়েছেন। অন্যরা কিন্তু তখনও কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন নি। তবে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিজেদের সবচেয়ে নিকমতম বন্ধু বলে মনে করতেন। গণ-মুক্তি পরিষদ ও জনশিক্ষা সমিতি তখন উপজাতিদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলতে পেরেছে। কমঃ দশরথ দেববর্মা ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে আত্মগোপন করে আন্দোলনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যে কিছু কমরেড্ সিলেট থেকে আত্মগোপন করে ত্রিপুরার বনে জঙ্গলে ঢুকে আন্দোলনের সাথে জড়িত লোকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে চলছিলেন। অত্যাচারে জর্জবিত পাহাড় অঞ্চলে তখন আগুন জ্বলছে। উপজাতিদের পাড়াগুলো (ছোট ছোট গ্রাম) আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে (এসব কথা আমি এই সমস্ত কাজে নিযুক্ত এক পুলিশ অফিসারের নিজ মুখে শুনেছি। তিনি আমাকে দুঃখের সাথে বলেছেন কি ভাবে নিরীহ গ্রাম-বাসীর বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও মিলিটারী অভিযানের সময় গ্রামের পুরুষ

মানুষ ভয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিত আর সাধারণ মেয়েরা বাড়ীতে থাকত। কাজেই প্রতিবাদ যা আসত তা মেয়েরাই করত তা সত্ত্বেও পুলিশ অবলীলাক্রমে তাদের অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালিয়ে যেত)। গ্রামগুলোতে লুঠতরাজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল।

আমি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই (খোয়াই পদ্মবিলে তাতুন প্রথার বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে মেয়েরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে। ননীকর্তা একদল মিলিটারী সহ পদ্মবিলে যান এবং প্রথামত দাবী করেন তাদের সমস্ত জিনিষপত্র বিনা পারিশ্রমিকে তাদের (গ্রামবাসীদের) বহক করতে হ'বে। কিন্তু গ্রামের মেয়েরা মধুতীর নেতৃত্বে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল এবং ননীকর্তাকে ঘিরে ফেলে এই অন্যায় প্রথা বন্ধ করার দাবী জানান। ক্রমে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করবে মিথ্যা আশঙ্কায় অত্যাচারী ননীকর্তার আদেশে মিলিটাবী গুলি চালায়। ফলে তিন মহিলা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। ত্রিপুরার বুকে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম শহীদ হলেন এই তিন বীরাঙ্গনা কুমারী, মধুতী ও রূপশ্রী।

উপজাতিদের মধ্যে প্রতিরোধ আন্দোলন এভাবেই শুরু হয়। ত্রিপুরার বুকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই বীরাঙ্গনা তিন মহিলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই ঘটনার তাৎপর্য হল—ত্রিপুরার বুকে প্রতিরোধ আন্দোলনের বাস্তব অবস্থার ক্ষেত্র তখন প্রস্তুত এবং তা উপজাতিদের জাতিসত্তা বিকাশেব সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। এর মূল্যায়নে ভুল করা হলে ত্রিপুরার বুকে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়তেই হবে মারাত্মক বিচ্যুতি।

বংশী ঠাকুরের মারফৎ আমরা পাহাড়ের খবর জানতে পারতাম। আমরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখতাম। প্রায়ই সন্ধ্যার পর লুকিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতাম। তখন বংশী ঠাকুরের বাড়ীব কাছাকাছি অঞ্চল বেশ অনেকটা নির্জন ছিল। সংলগ্ন অঞ্চলে একটি মাঠ ছিল। সেখানে ছিল গোপী দেববর্মার বাড়ী। তখন আর একটু সুযোগ ঘটল। ময়দানে তখন চলছিল মেলা। যেটা ছিল আগরতলার বহুদিনের বাৎসরিক কেনা-বেচার হাট। দীর্ঘ বছর ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। অবশ্য তার স্থান পরিবর্তন হতে হতে শেষ পর্যন্ত রাজবাড়ীর কাছে এই মেলার স্থান নির্বাচিত হয। কালের পরিবর্তনে এ মেলা আজ নির্বাপিত। শুধু রেশ থেকে গেছে কোন পূজা পার্বণ উপলক্ষ করে আগরতলা শিব বাড়ীর কাছে রাস্তার ধারে এ মেলা বসার মধ্যে। আর পরিচিত সেই মেলার মাঠ আজ ঘন বসতিপূর্ণ আবাসভূমি। মেলার আর অন্য পরিচয় রয়েছে 'মেলার মাঠ আজ ঘন বসতিপূর্ণ আবাসস্থলের অধিবাসীদের ঠিকানা হিসাবে চিহ্নিত হয়। সে কথা অবান্তর হলেও বলতে হল। আমাদের কাজের কথা বলতে গিয়ে এই মেলা উপলক্ষ করেই আমি বংশী ঠাকুরের বাড়ীতে যাবার সুযোগ করে নিতে পেরেছিলাম। বংশী ঠাকুরের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলাম আন্দোলনের কাজে সুবিধার জন্য কিছু জিনিষ প্রয়োজন। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজন একটি ডুপ্লিকেটিং মেশিন বিশেষ করে প্রচার পত্র ছাপাবার জন্য। আর দরকার কিছু অস্ত্র। ডুপ্লিকেটিং মেশিন আমরা কলকাতা থেকে কিনে আনার ব্যবস্থা করতে 'এয়ারলিঙ্ক (সে সময় মাল আনবার কাজে নিয়োজিত একটি এয়ার সার্ভিস) এর মালিক এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী বারীন চ্যাটার্জি আমাদের সাহায্য করেন। এবং কোন রকম ওজর আপত্তি না করে এই

মেশিন খরিদ করে আগরতলা আনবার ব্যবস্থা করেন এবং আমাকে তা বুঝিয়ে দেন। যথা সময়ে বংশীঠাকুর মারফৎ এই মেশিনটি পাহাড়ে যথাস্থানে চলে যায়। শুনেছি এই মেশিন যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল এবং এতে জন-শিক্ষা ও গণমুক্তি পরিষদের পক্ষে প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে সুবিধে হয়েছিল। অস্ত্র যোগাড়ের চেষ্টা করে আমরা সফল হই নি। আশা করেছিলাম বাংলাদেশে থেকে কিছু অস্ত্র যোগাড় করা যাবে— সে সম্ভাবনা যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে, ঠিক মত যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারিনি এবং প্রয়োজনীয় টাকারও অভাব ছিল। এ সময়ে আরেকটি বিশেষ ঘটনা হ'ল কমঃ দশরথ দেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ। বংশী ঠাকুর মারফৎ এই সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে একদিন রাতের অন্ধকারে আমরা দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় গিয়ে পৌঁছি। সেখান থেকে কমঃ দশরথ দেবের সাথে দেখা করবার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য একটি গ্রামে। গ্রামের নাম আমার জানা ছিল না এবং পরেও জানবার আগ্রহ প্রকাশ করিনি। তবে এটুকু অনুমান হয় যে ঐ গ্রাম দুর্গাচৌধুরী পাড়া হতে খুব দূরে অবস্থিত ছিল না। সেখানে এক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আমাদের আলাপ হয়। আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে মিলিটারী ও পুলিশ কর্তৃক গ্রাম ও পাড়াগুলোর উপর আক্রমণ ও নির্মম অত্যাচার। আমরা উভয়ে একমত হই যে, মিলিটারী অত্যাচার প্রতিরোধ করতে হ'বে— তা না হ'লে জনগণের নৈতিক বল ভেঙ্গে পড়বে এবং আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হবে। প্রতিরোধ আন্দোলনের ব্যাপকতা এরপর থেকেই শুরু হয়। এবং তা পরবর্তী সময়ে সমস্ত প্রশাসনকে অচল করে দেয়। সাক্ষাতের পর আবার আমরা রাতের অন্ধকারেই ফিরে আসি এবং পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে খুব ভোরে বাসায় ফিরে আসতে সক্ষম হই।

আমার লেখার ও বলার অধ্যায় এখানেই শেষ করলাম। শুধু দু'একটি সিদ্ধান্তের কথা বলেই এ অধ্যায় শেষ করছি। এ সময়ে ত্রিপুরার অবস্থা বিবেচনা করে এবং আন্দোলনের গতি ও তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে আমরা একটি মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম এবং আমরা স্থির করেছিলাম যে এই মুহূর্ত উপজাতি এলাকায় কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজ হবে অনেকটা হঠকারিতা. আমাদের সমস্ত সময় তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে হবে এবং তাদের পাশে থেকে সর্বপ্রকারে আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রমাণ করতে হবে কম্যুনিষ্টরাই তাদের একমাত্র বন্ধু। কমঃ অঘোর দেববর্মা যিনি কম্যুনিষ্ট পতাকা তুলে কম্যুনিষ্ট বলে পরিচয়ের ভিত্তিতে কাজ করে যেতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা আমরা হঠকারী কাজ বলে আখ্যায়িত করি। আমাদের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আন্দোলনের প্রসার ও গতিবেগ ধীরে ধীরে গড়ে উঠবার মধ্য দিয়ে পরবর্তী কিছু সময়ের মধ্যেই কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠে। এ কাজে যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তাদের অবদান অনস্বীকার্য। যতদূর জানি তাকে দেখা যায় সিলেট থেকে আগত কতিপয় কমরেড্ বিশেষ করে প্রাণেশ বিশ্বাস ও তার সাথীবৃন্দ এবং আগরতলার যুব কর্মীগোষ্ঠী গৌরাঙ্গ দেববর্মা, দ্বিজেন আচার্য, বঙ্কিম চক্রবর্তী (আন্দামান প্রত্যাগত স্বাধীনতা সংগ্রামী) প্রমুখের ভূমিকা ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট

১৯৫১ থেকে ১৯৯৭, মোট ৪৪ বছর। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলন আজ এক সংকটময় মুহূর্ত্তে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় থমকে দাঁড়িয়েছে। চল্লিশের দশকের সংগ্রামী মেজাজ আজ ভিন্নতর পরিবেশের মধ্যে পরে মনে হতে পারে খানিকটা নিস্তেজ এ তুলনা নিরর্থক। আমাদের ভুললে চলবে না যে আজ অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করে এক জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এবং আন্দোলনের গতি পথও ভিন্ন ভিন্ন রূপে বহুধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ প্রশ্ন হল তার গতিপথে চিহ্নিত করা। তার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সংঘাতমূলক অবস্থার গুলোর বিশ্লেষণ করা। বিভিন্ন বর্গের মধ্যে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর যে সংঘাতমূলক অবস্থান তাকে চেষ্টা করা বুঝতে হবে। তাকে গণতান্ত্রিক চেতনবোধ উজ্জিবীত করা যায় সে পথ নির্ণয়ে সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। ৪৭ বছর ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেমে থাকেনি। কম্যুনিষ্ট পার্টিও তার অবদান রেখেছে। তার কলেবব বৃদ্ধি ঘটেছে। জনমনে তার প্রভাব সংগ্রামের মধ্যেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ঘটেছে ও ১৯৭৮ সনে পার্টি শাসন ক্ষমতায় যাবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আজও এই ক্ষুদ্র রাজ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি বামফন্ট সরকার। এ হ'ল প্রাক ভারত ভুক্তি সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি, প্রতিরোধ আন্দোলনে সমাপ্তি ঘটে বলতে হয় ১৯৫২ সনে প্রথম নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষনার সাথে সাথে। পার্টি সীদ্ধান্ত নেয় নির্বাচেন ভাগ নিতে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক পথে পরিক্রমা।

চল্লিশের দশকে ভারতভূক্তির পূর্বে গণ আন্দোলনের যে দাবী ছিল ভারতভূক্তি ও প্রজার ভোটে প্রজার শাসন, শিক্ষার বিস্তাব ও মহাজনী প্রথাও বিলোপ ও জুমিয়াদের কৃষিতে উত্তরোণ তার মধ্যে রাষ্ট্রের পরিকাঠামোতে পরিবর্তন ঘটে ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে ত্রিপুরা স্থান করে নিতে পারে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক কাঠামো মূল উপাদান অপরিবর্তিত থেকে যায়, সামন্ততন্ত্রেব নিগড় ভেঙে ভূমি ব্যবস্থার কোন আমূল সংস্কার হতে পারে নি। গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের মূল একটা দাবী ছিল "Plough be cow" অর্থাৎ হো culture থেকে কৃষিতে রূপান্তর, কিন্তু বলতে হয় শিক্ষা আন্দালনে যে সাফল্য এসেছিল একটি সক্রিয় আন্দোলন সংঘটিত হবার মধ্যে, সেইরূপ কৃষিতে রূপান্তর ঘটবার জন্য কোন সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলা যায় নাই। প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক গণ-তান্ত্রিক অধিকারের জন্য, ভাবত ভূক্তির জন্য। প্রজার ভোটে সরকার গড়ার জন্য ।জাতিসত্তা বিকাশের জন্য। কাজেই গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন ও কম্যুনিষ্ট পার্টি কোন্ নির্দ্ধারিত পথে অগ্রসর হয়ে বর্ত্তমান কাল পর্বে— যে পর্ব সূচিত করছে বিশ্বময় এক সংকট এসে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার সমাধানে সংগ্রাম করে চলছে তারই এক অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করা বোধ হয় অনুচিত হবে না। যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল তা স্বাধীনতার পরবর্ত্তি সময়ে এক ভিন্নতর পরিবেশ তা এক নূতন মোড় নেয়। দেখা গেল উৎপাদন ব্যবস্থায় বাঙ্গালী-মুসলমান চাষীদের প্রাধান্য ধীরে

ধীরে লোপ পেতে থাকে ; ত্রিপুরীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। পাঁচ দশকের প্রথম পাদ থেকে ছ'দশকের প্রথম পাদ পর্যন্ত (১৯৫১-১৯৬৭) ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে যে বিপর্যয়— তার হাত থেকে পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ফলে এক ভারসাম্যহীন ও অস্থিতিশীল প্রবণতা লক্ষ করা যায়। স্বভাবতই গণতন্ত্রের বিকাশে এ ছিল এক বিরাট বাধা। এই অবস্থায় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে কাজ করতে হয় সংসদের ভিতরে ও বাহিরে এবং রাজ্যস্তরে বিধানসভায়ও বাহিরে জনগণের অধিকার রক্ষায়। শাসক দল হিসাবে কংগ্রেসকে দেখা যায় সুবিধা ভোগী ও পরজীবী মানুষের প্রতিভূ হিসাবে।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের জনজীবনের এক ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে। দলে দলে বাস্তহারা মানুষের স্রোত ত্রিপুরার জমিতে এসে আছড়ে পড়ে। আর্তের সাহায্যে খুলে দেওয়া হয় রাজ্যের সমস্ত দরজা। দ্রুত তালে চলে পুনর্বাসনের কাজ। একটী রাষ্ট্রের প্রশাসনের কাজে উদ্বাস্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় জরুরী ভিত্তিক কাজ। উপেক্ষিত হতে থাকে ত্রিপুরার জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সর্বপ্রকার উদ্যোগ। বনভূমি ধ্বংস হতে থাকে, পার্বত্য উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ভূমি করা হয় মুক্ত। রাস্তাঘাট, স্কুল, ডাক্তারখানা ; পানীয় জলের ন্যূনতম সুবিধা সবই মঞ্জুর হয় উদ্বাস্তুদের জন্য। এ ছিল গ্রাম ও নগর জীবন গড়ে তুলবাব সাড়াজাগানো কাজ। এই কর্ম যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হ'ল ত্রিপুরার বঞ্চিত শোষিত অধিবাসীদের।

এই অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশের ধারা কিভাবে কাজ করে যাচ্ছিল?

১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন প্রমাণ করল এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক মানুষ কম্যুনিষ্টদের পক্ষে। ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা গেল দুটি আসনেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থী কমঃ দশরথ দেব ও কমঃ বীরেন দত্ত অধিকাংশের ভোটে নির্বাচিত। মনে রাখা দরকার পার্টি তখন বে-আইনী ঘোষিত ছিল। নির্বাচন ঘোষাণার সাথে সাথে প্রকাশ্য সমাবেশ করবার সীমিত ক্ষমতা পেল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার অর্জন করল। রাজ্যে তখনও বিধিবদ্ধ ভাবে সংবিধান গৃহীত শাসন কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সূচিত করল না। রাজ্যের সংবিধান মোতাবেক ত্রিপুরা গণ্য হ'ল একটি গ শ্রেণীর রাজ্য-যেখানে বিধান সভার কোন সংস্থান নেই। ফলে রাষ্ট্রপতি ক্ষমত বলে দেওয়া হ'ল একটি Electoral College নির্বাচিত সদস্যদের আইন প্রনয়নের কোন ক্ষমতা থাকল না। শুধু অন্য একটা রাষ্ট্র মণিপুরের সাথে পালাক্রমে রাজ্য সভায় পাঠাতে পারবে একজন প্রতিনিধি। ফলাফল বিচারে দেখা গেল এক্ষেত্রেও কম্যুনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রাধান্য। ১৯৫৩ সনে মনোনীত কয়েকজন কংগ্রেস নিয়ে গঠিত হ'ল চিফ্ কমিশনারে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী। ১৯৫৬ সনে রাজ্য ঘোষিত হ'ল একটি কেন্দ্র শাসিত আর এক ধাপ উচু-র মর্য্যাদা নিয়ে Union Territory। Electroral College এর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গড়া হল ত্রিপুরা Territorial Council। ক্ষমতায় থাকলেন শচীন্দ্র লাল সিং। সীমিত কিছু ক্ষমতাও দেওয়া হ'ল-শিক্ষা, পানীয় জল ও রাস্তাঘাট-উন্নয়নের ক্ষমতা দেওয়া হ'ল মাত্র।

ভবিষ্যৎ দিক নির্ণয়ে এ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে আংশিক দায়িত্ব দেওয়া।

স্ব-বিরোধী হলেও এই Council (T.T.C.) গড়া হ'ল গণতান্ত্রিক কায়দায় নির্বাচনের মাধ্যমেই। দেখা গেল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে কংগ্রেস ব্যর্থ হলেও দু'জন মনোনীত সদস্যের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতায় দায়িত্ব গ্রহণ করল কংগ্রেস। এ ছিল এক প্রহসন। রাজ্যবাসী এ ব্যবস্থা খোলা মনে মেনে নিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে অব্যাহত থেকেছে পূর্ণ রাজ্যের দাবীতে। এ সময় অন্য একটি ষড়যন্ত্রও ছিল অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আসামের এক অংশ যোগ করে একটি নূতন রাজ্য গড়বার আন্দোলন প্রয়াস চালানো হয় কিছু নবাগত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের নিয়ে। তাদের পরিকল্পনা ছিল ত্রিপুরার মানচিত্রের এক বিরাট পরিবর্তন এনে একটি নূতন রাজ্য সৃষ্টি করা যেখানে বাঙ্গালীদের একটি স্বতন্ত্র ভূমিতে বাঙ্গালীদের একাধিপত্য বিরাজ করবে। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের মানসিকতা ছিল উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রচ্ছন্ন ভাবে হ'লেও জাতি বিদ্বেষ এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। এর প্রতিবাদে ত্রিপুরার সমস্ত গণ-তান্ত্রিক মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে জয়যুক্ত হয়। এই বিক্ষোভ আন্দোলনে সমস্ত অংশের মানুষের ভূমিকা ছিল। সকলেই ত্রিপুরা রাজ্যের অখণ্ডতার জন্য প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তোলে। T.T.C নয়, সীমিত ক্ষমতার বিধানসভাও নয়, পূর্ণ রাজ্যের দাবীতে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৬৩ সালে দেওয়া হ'ল গ শ্রেণী রাজ্যের বিধানসভা গড়বার অধিকার এবং মুখ্যমন্ত্রী হ'লেন শচীন্দ্রলাল সিং বিধানসভায় নির্বাচিত কংগ্রেস দলীয় নেতা হিসাবে।

১৯৫২ সনে গঠিত হয় Electoral College, ১৯৫৩ সনে উপদেষ্টা মন্ডলী থেকে ১৯৬৩ সনে বিধানসভা পর্যন্ত একাদিক্রমে দশবছর এ রাজ্যে কংগ্রেস কেন্দ্রের পক্ষপুটে থেকে শাসন ক্ষমতায় কাজ করেছে। কিন্তু রাজ্যের কোন উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেয় নি— সে চেষ্টাও ছিল না। কার্য্যতঃ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কোনঠাসা করবার সমস্ত চেষ্টাই অব্যাহত ছিল। এ সময়টা ছিল ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অন্ধকারময় যুগ। কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রশাসনকে সমস্তভাবে ব্যবহার করেছে। রাজদরবারে মানুষ যেমন নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ-পুষ্টি হ'ত ও সেইরূপ কংগ্রেসও কিছু সুবিধা ভোগী লোকের সুযোগ সুবিধা দিয়েছে এবং জনসাধারণকে অসত্য ভাষণে এবং কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী ; উপজাতি বিদ্বেষী করে তুলবার সমস্তরকম প্রচেষ্টা নিয়েছে।

এ সময় কালে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ থাকে নি। কোন কোন সময় জনস্রোতের প্রবল বেগ সমস্ত প্রশাসনের দৃষ্টি নিবিদ্ধ থাকত সেদিকে। উদ্বাস্তুদের কাজে ব্রতী বিরাট কর্মীবাহিনী দিয়ে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার সংগ্রামের বাস্তব ভিত্তিও মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে কোন সংগ্রামই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। ত্রিপুরার রাজনৈতিক অধিকারের আংশিক প্রয়োগ ছিল কংগ্রেসের জনগণের উপর অবিশ্বাসের প্রতিফলন। গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সামন্ত তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বজায় রেখে উন্নয়নের কোন কাজই বাস্তবায়িত করা যায় না সমাজ প্রগতিও অসম্ভব। কাজেই এ পর্বে ১৯৫২-১৯৬৭ এই পর্বে ত্রিপুরার মানুষ সামন্ততন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্তি সংগ্রামে বিফলতা ছিল মূলতঃ একটি রাজনৈতিক ও গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের স্বরূপ।

কম্যুনিষ্ট পার্টি বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে, মিছিল সমাবেশ করেছে, ত্রিপুরা রাজ্যের অখণ্ডতা রাখতে সংগ্রাম করেছে। সংবিধানে উল্লিখিত গণ-তান্ত্রিক অধিকারের ব্যাক্তি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, নির্য্যাতিত হয়েছে কিন্তু মূল সমস্যা জন-জাতি-জীবনে নূতন উদ্ভুত পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন ও আন্দোলনের গতিপথ চিহ্নিত করতে পেরেছে কিনা সে আজ বড় জিজ্ঞাস্য?

পূর্বেই উল্লেখ করেছি সংগ্রামের বাস্তব ভিত্তি ও মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে কোন সংগ্রামই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। ত্রিপুরায় স্বামন্ততন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্তি এখনও ঘটেনি। জনজীবনের ন্যূনতম দাবী ও পূরণ হয় নি কিন্তু অসন্তোষ প্রশমিত করতে খয়রাতি সাহায্য মাঝে মধ্যে এমন ভাবে করা হত যা গণ-আন্দোলনকে সরকারী সাহায্য পেতে উৎসাহিত করত এবং গণ-আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করত। উদ্বাস্তু জীবনের বাস্তবতা ছিল সরকার নির্ভর সাহায্য নিয়ে বাঁচবার জন্য একটু স্থান করে নেওয়া। কাজেই খয়রাতি সাহায্য ছিল তাদের একমাত্র সঙ্গতি। ফলে মানসিকতা ছিল সরকার বিরোধী কোন আন্দোলন না করা। ইহা ছাড়া উদ্বাস্তু মানসিকতার অন্য একটা দিক বাস্তুহারা জীবনের কারণের উৎস খোঁজ নয়। তাদের কাছে সদ্য নিগ্রহের কারণ হিসাবে মনে হয়েছিল দাঙ্গা - প্রচ্ছন্নভাবে সরকার এই অমূলক ধারণার বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরেনি। বরং দেখা যেত প্শাসনের প্রতি কাজে মুসলীম প্রজা সাধারণের বিরুদ্ধে একটা অলিখিত আচরণ বিধি গ্রহণ করা হয়েছিল যা মনে হত মুসলীমরাই ভারত বিভাগের জন্য দায়ী। এবং তাঁরাই দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা নিয়েছে।

এই সমস্ত বক্তব্যও মুসলীম বিরোধী মনোভাবকে উৎসাহিত কবত এবং কম্যুনিষ্ট পরিচালিত গণ-আন্দোলনকে বিভাজন আনতে সাহায্য করত। গণ-আন্দোলন এই বিভাজন উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করেছে। উদ্বাস্তু বসতিগুলি ১৯৬০ সাল নাগাদ মোট জন সংখ্যার এক বিরাট অংশে পরিণত হয়। তথাকথিত পুনর্বাসন কাজ তখন প্রায় সমাপ্তির পথে। পরবর্ত্তী ১৯৬৪ সনে আবার বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু সম্পত্তি বদল করে এদেশে আসতে শুরু করে। ফলে এই অগণিত জনস.খ্যা তখনকার পরিস্থিতিতে শাসকবর্গেব কাছে প্রতীয়মান হয় যে এই জন-শক্তিকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করে ভোটাধিকার দেওয়া এবং এশক্তিকে ভোট যুদ্ধে নিজেব অনুকূলে আনা। তীব্র জন-অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন তখন এক শক্তিশালী পার্টি হিসাবে কংগ্রেস দলের কাছে এক বড় Challenge. কাজেই তাদের তড়িঘড়ি করে ভোটাধিকার দেওয়া হল। বে-আইনী ভাবে জমি দখলের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করা হ'ল না। Reserve বন পাহাড়ে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ ছিল অবাধ। উদ্বাস্তুদের কাছে ত্রিপুরা হয়ে দাঁড়াল অনেকটা বসতি গড়ে তুলবার জন্য মরণপণ জীবন সংগ্রাম। সরকার যতই ঘোষণা করেছিল পুর্নবাসনের দায়িত্ব ভারত সরকারের নৈতিক দ্বায়িত্ব কিন্তু দেখা গেল ত্রিপুরাতে এই কাজে দায় দায়িত্ব সব অস্বীকার করলেন । এই সমস্ত কাজের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। পার্লামেন্ট ও বিধানসভা ত্রিপুরার মৌলিক সমস্যা সমূহ তুলে ধরেছে। ভূমি সংস্কার আইন গ্রহণ করতে জোরাল যুক্তি রেখেছে। ১৯৬০ইং ভূমি সংস্কার আইন চালু করবার জন্য প্রচার অভিযান সংঘটিত

করেছে। জন জীবনের প্রতিটি সমস্যা তুলে ধরে তার প্রকৃত সমাধানে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করবার দাবী সনদ সর্বত্র প্রচার অভিযানে বক্তাবের মধ্যে অত্যন্ত জোরাল ভাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে সে সমস্ত দাবী শুধু উপেক্ষিত হয় নি পরন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন মূলক সমস্ত ব্যবস্থা ছিল সে সময়ের স্বাভাবিক ঘটনা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ব্যর্থতা ত্রিপুরার সবচেয়ে আঘাত করেছে উপজাতিদের। তাদের মৌলিক সমস্যা সবই অসমাপ্ত থাকে। গণ-অসন্তোষের প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক পার্টির মধ্যেও এবং রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয় অনেক দল ও উপদল।

স্বাধীনোত্তর ভারতে আজোও বহু সমস্যা অমীমাংসিত। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন ছিল একটি অসীমাংসিত কাজ। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করতে গিয়ে অনেক নূতন রাজ্য ভারতবর্ষের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু এখনও অনেক জনজাতি গোষ্ঠি এখানে সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রয়ে গেছে। যাদের দাবী আজও উর্পেক্ষিত হয়ে চলেছে।

ত্রিপুরা রাজ্য হ'ল এমন একটি রাজ্য যার অবস্থান ভারতবর্ষের মানচিত্রে বহুদিন ধরে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে আপন সত্ত্বায় বিরাজ করছিল। ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরা ছিল একটি করদ রাজ্য - কয়েকটি জনজাতির বাসভূমি। ভারতভুক্তির পর যে সমস্যা যোগ হ'ল তা হ'ল এই রাজ্যকে মুখামুখি হতে হ'ল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অসমান অবস্থান নিয়ে — সভ্যতার দুটি স্তরে দুটি জনগোষ্ঠি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ল রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙ্গালী আধিপত্য সুস্পষ্ট হ'ল। কম্যুনিষ্ট পার্টি এই সময়, এই অবস্থায় কোন বিকল্প সমাধান সূত্র উপস্থিত করে জন-জাতির আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে মূল্যায়ন করে একটি বিকাশমান জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে পথ নির্ণয়ের প্রশ্নে ব্যর্থ হ'ল। গণ তান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যর্থতায় সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি।

পরবর্তী কয়েক বছর পর কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে উপজাতি অংশের কিছু সংখ্যক যুবকের নেতৃত্বে গড়ে উঠল উপজাতি যুব সমিতি। এ ছিল অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই দলের কার্যকলাপ রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ ত্রিপুরার রাজ্য রাজনীতির নূতন মোড় সূচনা করে। অন্য প্রতিক্রিয়া দেখা গেল আমরা বাঙ্গালী নামে অন্য একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনের আত্মপ্রকাশের মধ্যে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এদের কোন ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না।

এই সময়কালে ছ'দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে ঘটনা উল্লেখের দাবী রাখে যা হ'ল রাষ্ট্রশক্তির পরিপূর্ণ মদতে মুসলিম নাগরিকদের এ রাজ্য থেকে বিতাড়ন— জোর পূর্বক বহিষ্কার। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে এই কাজ ছিল সংবিধান বিরোধী, এই কাজে অমানবিক। অন্য অর্থে এই কাজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকেই মদত জুগিয়েছে। এই রাজ্যে মুসলিম বিরোধী শক্তিই পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হ'ল কম্যুনিষ্ট পার্টি এই সময়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। কংগ্রেসও নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে সরকারী কাজে উৎসাহ দিয়েছে।

মৌলিক দু'টি প্রশ্ন — উদ্বাস্তু সমস্যা ও Ethric সমস্যার বিস্তার ও ব্যাপকতা ছিল এত বেশী বাস্তব যে আপাত পরস্পর বিরোধী হ'লেও এই প্রশ্নের সমাধানের পথ খুঁজে নেওয়া ছিল জরুরী কর্তব্য। আর দু'টি প্রশ্নই একান্তভাবে মূলতঃ জমির সাথে জড়িত। উন্নয়নের গতিপথ চিহ্নিত করতে হলেও ভূমি বন্টন ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ কববার প্রয়োজন একটা স্বীকৃত নীতি। প্রকৃত সমাধান সূত্র খুঁজে গণতান্ত্রিক আন্দোলন না করতে পারায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ষাটের দশকে রাজনৈতিক অস্থিরতা আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই দেখা যায় Ethric প্রশ্নে উপজাতি যুব সমিতি একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দাবীসমূহ নিয়ে জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'ল। অন্যদিকে আমরা বাঙ্গালী উগ্র বাঙ্গালী জাত্যাভিমানের দাবী নিয়ে উপজাতি বিদ্বেষী হিসাবে একটি সাম্প্রদায়িক দল রাজনৈতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করল। এ বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৬৭ সনের নির্বাচনের ফল সূচিত করে ত্রিপুরাব অবস্থা বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে ফেলেছে। জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল স্বাভাবিক এবং দ্রুত গতিতে এবং তা হয়েছিল নিষেধের গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে। পাহাড়ী জনপদ বলতে সামগ্রিক অর্থেই হয়ে গেল একটি মিশ্র জনপদ। কম্যুনিষ্ঠ পার্টি এই পরিস্থিতিতে জমিতে অধিকার রক্ষার সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারে নি। কিন্তু উপলব্ধি করতে পেরেছিল পাহাড়ী জীবনযাত্রার গতি স্তব্ধ। ১৯৬৭ সনে নির্বাচনে পাহাড়ীদের সামান্যতম দাবী পঞ্চম তপশীলের প্রয়োগ একটু স্বাধিকারের প্রশ্ন অস্বীকৃত হ'ল। বিপুল ভোটে কংগ্রেসের জয় সূচিত করল বাঙ্গালী উগ্র জাতীয়তাবাদের কতটা প্রভাব।

১৯৭২ সনে এ রাজ্য পূর্ণ বাজ্যেব মর্যাদা পেল। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনেব ফলে কংগ্রেস মনে করল প্রথম পূর্ণ ক্ষমতা পেয়ে রাজ্য শাসন করতে পারবে এবং কম্যুনিষ্ঠ পার্টিকে দাবিয়ে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙ্গালীদেব উগ্র জাতীয়তাবাদকে সুড়সুড়ি দিয়ে এরাজ্যে এক দলীয় শাসন প্রবর্তন করতে পারবে। সংগ্রামী শক্তি নিয়ে লড়াই করে কম্যুনিষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসেব সে আশাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। সে আলোচনায় আমরা একটু পরে আসছি।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেস রাজত্বের স্বর্ণ যুগ। কংগ্রেস তার শাসনব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে কিছু সংস্কারমূলক কাজ করেছে। ভাবী শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। জমিদারী প্রথা বাতিল করেছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করেছে। গণ-তান্ত্রিক একটি শাসনব্যবস্থা চালু করে সংবিধানের মধ্য থেকে কিছু কিছু জনহিতকর কাজের উদ্যোগ নিয়ে তার প্রতিপক্ষ বিরোধী সমস্ত শক্তিকে দাবিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু জনহিতকর উদ্যোগগুলি বাস্তবে রূপায়িত হতে না পারলেও জনমনে প্রভাব ফেলে নিজের শ্রেণী স্বার্থে এমন অনেককিছু করেছে যা হয়ে উঠেছিল সুযোগ ও সুবিধাভোগী কিছু সংখ্যক লোকের প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের উপর তাদের শোষণ ও নিপীড়ন।

কম্যুনিষ্ঠ পার্টি এই পবিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্তরে এমন কোন কাজ করতে পারে নি যা

ভারতে মূল সমস্যাগুলির সমাধান করে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত অংশের খেটে খাওয়া মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ফলে পার্টির মধ্যে যে আত্মসমালোচনা ও ঘটনাচক্রে এমন কতগুলি ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত হয় যার ফলে পার্টি দুভাগ হয়ে যায়। বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এই বিভাজন ছিল বাম আন্দোলন গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে এক বড় প্রতিক্রিয়া। যদিও পার্টি কংগ্রেসের দমন-পীড়ণ সত্ত্বেও তাকে প্রতিবিপ্লবী শক্তির সাথে হাত মিলাতে দেয় নি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি U. S. A. -এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেয় নি।

১৯৬৭ সনে নির্বাচন দেখিয়ে দিল পঞ্চম তফশীলের আওয়াজ কত ফাঁকা ছিল। পঞ্চম তফশীল উপজাতিদের কোন স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে এই আওয়াজ বাঙ্গালী উপজাতীয়তাবাদীদের হাতে হাতিয়ার হয়ে গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের বর্শামুখকে ঘুরিয়ে দিল প্রতিক্রিয়ার দিকে।

'৬৭ নির্বাচন ছিল সবদিক থেকে প্রহসন। শাসকগোষ্ঠি এই নির্বাচনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। সে তার বাহুশক্তিও ব্যবহার করে এ নির্বাচনে। সে যাহা হোক কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং শচীন সিং মন্ত্রসভার বিদ্রোহী গোষ্ঠি জোট বাঁধে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে '৭২ সনে সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রী হওয়া সম্ভব হয়। একটি অসময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য দেশব্যাপী অসন্তোষের ঝাঁপটা ত্রিপুরায় এসে আঘাত করেছে। এ সময় দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল। C P. M. পার্টি আন্দোলন সংগঠিত করতে চেষ্টা করছে। শিক্ষক আন্দোলন তার নেতৃত্বে এ রাজ্যে সংগ্রামে ব্রতী। রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলন ও তার ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। C. P. I এক ভুল রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করে যাচ্ছে। সংগঠন তার দুর্বল C. P M সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারছে। কিন্তু পাহাড়ী জনপদে দুর্ভিক্ষের ছায়া। তাদের কথা উচ্চারিত হলেও খয়রাতি সাহায্য ও জুমিয়া পুনর্বাসনের দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার মৌলিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর রূপ পরিবর্তনের কোন সুষ্ঠু কর্মসূচী দেখা যায় না। ষষ্ঠ তফশীল নিয়ে একটি ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জরুরী অবস্থার মধ্যে আন্দোলনকে শাণিত করার পথ তখনও উন্মুক্ত হয় নি। পাহাড়ীদের মধ্যে উগ্রজাতীয়তাবাদ স্থান করে নিয়েছে। উপজাতি যুব সমিতি উগ্রজাতীয়তাবাদের আওয়াজ নিয়ে পাহাড়ে নিজ অবস্থান অনেকটা সুদৃঢ় কবতে পেরেছে।

এই যখন অবস্থা তখন কংগ্রেস ভেঙ্গে C F. D তারপর C. F. D মন্ত্রীসভা একবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল দাস, দ্বিতীয়বার রাধিকা গুপ্ত, C. F D মন্ত্রীসভা C. P. M -এর যোগদান। এক নূতন পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিপুরার বাজনীতি। গণ আন্দোলনের বর্শামুখ অনেকটা নিষ্ক্রিয়। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি; অশান্ত পরিবেশ, কোন পার্টিই জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারছে না। জরুরী অবস্থার শেষ সময়। হঠাৎ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে এবং অনেকটা সম্রাজ্ঞীর মতন গণতন্ত্রকে একান্তভাবে নিজের খামখেয়ালীর মত ব্যবহার করে বিচার বিভাগকে অবজ্ঞা করে চলতে শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে হেরে গেলেন। মুরারজী দেশাইর জনতা দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করলেন মিলিজুলি এ সরকাব বেশীদিন টিকল না। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণ

প্রমাণ করল সংবিধানের গণ-তান্ত্রিক চরিত্রকে তারা পদদলিত হতে দেবে না। বিজয় স্বল্পকালিন হলেও কংগ্রেস রাজনীতির অবক্ষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯৭৮ সনের নির্বাচনের ফলাফল সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করল এ রাজ্যের কংগ্রেস রাজনীতি এক সংকটের আবর্তে এই নির্বাচনে কংগ্রেস একটি আসনও পেল না। C. P. M. পেল ৫৬টি আসন ; আর উপজাতি যুব সমিতি পেল ৪টি আসন। উপজাতি যুব সমিতি প্রমাণ করল এই রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের দাবী উপেক্ষিত হয়ে আসছে। গণ-তন্ত্রের প্রক্রিয়ায় তাদের জাতিসত্ত্বা বিকাশ লাভ করতে পারে নি। তাদের অধিকৃত জমি থেকে তারা উচ্ছেদ ; তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো মোটেই গড়ে উঠেনি; তারা আজ ভীষণভাবে অবহেলিত।

অন্যদিকে কংগ্রেসও মিলিত বাঙ্গালী উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রতিশোধ নিল ১৯৮০ সালে এক ভীষণ জাতি দাঙ্গা সংগঠিত করে। সম্প্রীতি ও ঐক্যে বুনিয়াদ— তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে দাঙ্গা দুই জাতির মধ্যে এক বিভেদের বীজ বপন করে নিল। ক্ষেত্র প্রস্তুত করল উগ্রপন্থী আন্দোলনের— যা ত্রিপুরার বুকে আজ কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। কেন এমন হ'ল।

'৬০ দশকের শেষে, গোটা সত্তর দশক ধরে ত্রিপুরার রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল নগরমুখী। গ্রাম পাহাড়ে তৃণমূলে আন্দোলন ছিল শুধুমাত্র অতীত আন্দোলনের মধ্যে গড়া অঞ্চলকে নিজের কক্ষপুটে রাখার প্রয়াস মাত্র। দল, উপদলগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা, দর কষাকষি সমঝোতার ভিত্তিতে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিজ শক্তির পরিচয় দিতে হতো আগরতলা শহরে জমায়েত ও মিছিল করে। আর তা করা হয়েছিল লোক জমায়েতের নূতন নূতন উদ্ভাবনার মধ্যে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির M সংগঠন শক্তি এসময় এক নির্দিষ্ট রূপ নেয়। কর্মচারী আন্দোলন তখন শীর্ষে। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রভাব তাদের মধ্যে সক্রিয় করে তোলে অনেক তরুণ শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন ত্রিপুরার বুকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। C P I জরুরী অবস্থার ভুল রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বামধর্মীদের কাছে তখনও সে নিজের বিপ্লবী পরিচয় নিয়ে পারস্পারিক বোঝাপড়া করতে পারে নি। তার সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে গণ-আন্দোলনের অঙ্গনে যেতে সময় লাগবে। তাকে বাম ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

১৯৭৮ সনের ইলেকশন হয় একটি বামমোর্চার গঠনের মধ্যে C. P. M , C. P. I, F.B. ও R. S. P এই চার দল এক যৌথ দাবীসনদ নিয়ে নির্বাচন লড়েও বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ১৯৮০ সনে বামফ্রন্ট দাঙ্গা আয়ত্বে নিয়ে এসে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। জনগণের উভয় সম্প্রদায়ের সাথে তার নিবিড় যোগসূত্র আবার গড়ে উঠে। কিন্তু কংগ্রেস রাজনীতি বাঁকা পথে ক্ষমতায় আসতে প্রয়াস নিল। তারা বেছে নিল বিভ্রান্তির রাজনীতি লক্ষ্য স্থির করল বামফ্রন্টকে যেভাবেই হোক গদিচ্যুত— করতে হবে। এ ব্যাপারে তারা সহাযতা পেল উপজাতি যুব সমিতি থেকে পৃথক হয়ে আসা বিজয় রাংখলকে। উগ্রপন্থী আন্দোলনকে গড়ে তুলে সে সীমাহীন অমানবিক কাজে অগ্রসর হল। রাজীব গান্ধী— ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে ১৯৮৮ সনের

নির্বাচনের পূর্বে নির্বিচারে উগ্রপন্থী হামলায় নিষ্ঠুরভাবে গণহত্যা সংগঠিত করে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি গড়ে তুলল। আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত এই অজুহাতে রাজ্য সরকারকে না জিজ্ঞেস করে এবং ডিঙ্গিয়ে ভোটের আগে ত্রিপুরার প্রান্তিক অঞ্চল জুড়ে মিলিটারী শাসন জারী করে দিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে প্রায় অচল করে দিল। ভোট হল - অনেক অনেক কেন্দ্রে মিলিটারী পুলিশের একাংশ কর্মচারীর যোগসাজসে। ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল বামফ্রন্ট প্রার্থী অনেকেই হেরে গেছেন। কংগ্রেস-উপজাতি যুব সমিতি জোট ক্ষমতায় ফিরে এল। গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনকে নিস্তব্ধ করে দিল। একটি অন্ধকারময় যুগ সূচিত হ'ল । রাজনীতি নূতন মোড় নিল। অসন্তোষ বহিঃপ্রকাশে গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে চোরাগুপ্তা পথে। এগুলো শুরু হ'ল অস্ত্র হাতে নিয়ে খুন ও সন্ত্রাসের রাজনীতি। ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করবার রাজনীতি।

গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ কিন্তু কংগ্রেস-উপজাতি জোট শাসন বরদাস্ত করল না। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানিয়েছে । ১৯৯৩ সনের ভোটে জোট সরকারকে পরাজিত করে বামফ্রন্টকে আবার শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে। গণতন্ত্রের এই বিজয় সূচিত করে ত্রিপুরার নাগরিক কি বাঙ্গালী, কি পাহাড়ী তারা সকলেই ঐক্য ও সম্প্রীতির মধ্যে বাস করতে চায়। ত্রিপুরাতে উন্নয়নে, প্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। দেশ বিভাগের মধ্যে যে হানাহানি ও হিংসার আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল- তা ছিল ভয়ঙ্কর। দেশ ছাড়তে হয়েছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনেব জন্য। তা ছিল এক ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আজ জাতিদাঙ্গা সংগঠিত হ'লে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি হবে সে চিত্র কল্পনায়ও আনা যায় না। এই ইতিবাচক দিককে তুলে ধবার দিকই আজ বামফ্রন্ট ও দেশপ্রেমিক মানুষের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু সমস্যা আরও আছে। তার গভীরে আমাদের যেতে হবে। দুটি জাতিগোষ্ঠির পাহাড়ী ও বাঙ্গালীব নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে ; নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বুনিযাদ আরও শক্ত করতে হবে. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তবকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীয়তা প্রসারও সুনিশ্চিত করে শিল্প ও কৃষিব পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, রাজনৈতিক মঞ্চ শুধু শহরে নয় তাকে প্রসারিত করতে হবে জনগণের মধ্যে, তৃণমূলে। প্রশাসনকে নিয়ে যেতে হবে সমাজের নীচুতলা পর্যন্ত শুধু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। প্রশাসনকে সুনিশ্চিত করতে উন্নয়নমূলক কাজে জনগণেব সক্রিয সহযোগ আনতে হবে।

দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার আদিম জনগোষ্ঠির ভাষা. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের তার জাতি বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল চিহ্নিত করে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন (৬ষ্ঠ তফশীল মোতাবেক) করার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে এবং বাস্তবায়িত করেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ কার্যকরী হয়েছে বলা যায় না। আজও A D. C ত্রিপুরা সরকারের নানা বাধা জালের শিকার। তাকে প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। উগ্রপন্থী সমস্যার মূল উৎসে যেতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতি অংশের মানুষ বিভিন্ন জনগোষ্ঠির তাব নিজ অধিকৃত জমি থেকে চ্যুত হয়েছে। সেই জমি পুনরুদ্ধারের কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, হৃত জমি পাওয়ার কোন আন্দোলন সংগঠিত হয় নি। আইনের বেড়াজালে পড়ে বে-আইনী অধিকৃত জমি একটা স্থিতাবস্থা

রক্ষা করতেও পারে নি। জমি কুক্ষিগত হয়েছে জোতদার ধনী কৃষকদের হাতে। জমি পণ্য হয়ে পাহাড়ী জীবনে নিয়ে এসেছে শুধু দুর্গতি। উগ্রপন্থী সমস্যার মূলে আঘাত করতে হ'লে জমি পুনরুদ্ধার ও সুষ্ঠু বন্টন করতে হবে। এবং এ কাজ কঠিন হলেও তৃণমূলে গণতান্ত্রিক প্রসার করেই তা করতে হবে।

একই সাথে নিশ্চয়তা দিতে হবে স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরায় আশ্রয়প্রাপ্ত ছিন্নমূল মানুষের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা। চাই একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা। যা গড়ে তুলবে শিল্প এবং প্রসার ঘটাবে বহিঃ ও অন্তঃ বাণিজ্যের। প্রাকৃত সম্পদে ভরপুর ত্রিপুরায় ছোটখাট অনেক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। ত্রিপুরার হরিৎ বনভূমিতে উন্নতমানের ফলবাগিচা গড়েও উঠতে পারে। পরিকল্পিতভাবে অর্থ বিনিয়োগ হ'লে জনসহযোগে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র গড়ে তোলার বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে শুধু খয়রাতি সাহায্য দিয়ে একটি রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান হয় না, হতে পারে না। আমরা জানি রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং মূলধনের অপ্রতুলতা এখানেই বামফ্রন্টের দায়িত্ব। বিকল্প প্রস্তাব রেখে ত্রিপুরার গণআন্দোলন ও গণচেতনা গড়ে তুলবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বামফ্রন্টের।

রাজ্যের শাসন সংস্কারে বামফ্রন্টের অবদান অনস্বীকার্য। তাদেরই একান্ত চেষ্টায় ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত অঞ্চল গড়ে উঠেছে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে শাসন ক্ষমতায় পূর্ণ অধিকার দিয়ে জনজাতিগোষ্ঠিব ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিকাশে একটা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে যাবতীয় ক্ষমতা দিতে হবে। রাজ্য সরকারের ছত্রছায়ায় রেখে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে কাজ করতে দেওয়া হলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নেবার সময় অতিবাহিত হতে দিলে দিন দিন শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নকারী শক্তিই এ রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে। বাঙ্গালী ও উপজাতি দুটি ভিন্ন স্তরের সংস্কৃতি ধারা, বৈচিত্র্যপূর্ণতার জীবন। ইতিহাসের নানা সংঘাতের মধ্য দিযে একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আজ বসবাস করছে। ইতিহাসের এই অমোঘ নির্দেশকে আজ মুছে ফেলা যাবে না। ভারত ইতিহাসের প্রবহমান সংস্কৃতিব আমরা ধারক ও বাহক। ভারতবর্ষের ঐক্য গড়ে উঠেছে বিচিত্র ধারার সংমিশ্রণে। আমরা সকলে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই মূলধারার অংশীদার। ত্রিপুরার গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন এই ঐক্যের বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে সুনিশ্চিত করবে এই আশা করা যায়।